শ্রীমলয় সেন
শ্রীসবিতা সেন
করকমলেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

পটভূমি

তালপাতার বাঁশি

সীমাস্বর্গ

কয়েদখানা

তবু, লাশের দেহে অসতর্কতার ছাপ থেকে গেছে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। খুন কখনই কোন শিল্পকার্যের মত ষোলআনা শোভন হতে পারেনা। এই কারণেই, লাশের গোটা মুখ তোবড়ানো। এক চোখ বোজা। অপরটি খোলা শুদ্ধ ডিমের মত ঠেলে-ওঠা; রক্তাভ এবং করুণ। বুকের বোতামগুলো খোলা। শার্টের এদিক-সেদিক অল্পস্বল্প ছেঁড়া। মাথার চুলের খানিকটা এলোমেলো কপাল ছাপিয়ে নেমে এসে মুখখানাকে রহস্যময় করে তুলেছে। হাঁটু থেকে দু'পা বেয়াড়াভাবে জলের দিকে নেমে গেছে।

এসব ত্রুটি অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে সাবাড় করা আর যাই হোক ছেলেখেলা নয়। ফলে, আততায়ীরা যথেষ্ট সতর্ক থাকলেও কিছু কিছু অসাবধানতার ছাপ রয়ে গেছে। তাছাড়া, লোকটাকে ঝটপট কাবু করে ফেললেও দেহধর্মবশত সে কিছুটা তো যুঝেছিল। সে বাঁচার চেষ্টা যতই নিস্ফল হোক না কেন। প্রধান খুনী যখন লোকটার গলায় অস্ত্র বসাচ্ছিল, তখন কেউ কেউ তার মাথাটা সজোরে লাইনের খোওয়ায় চেপে ধরেছিল। যাতে লোকটা মাথা নাড়িয়ে হত্যাকাণ্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। কিংবা অন্তিম প্রাণঘাতী চিৎকারে আশেপাশের লোকদের সজাগ করে তোলে। ফলত, আততায়ীরা লোকটার মুখ চেপে ধরার ব্যাপারে আদৌ সতর্ক কিংবা মমতাযুক্ত ছিল না।

একই কারণে পায়ের কাছে ছিল সম্ভবত এক কিংবা একাধিক ব্যক্তি। তারা পা দুটোকে বেয়াড়াভাবে ভেঙে জলের দিকে নামিয়ে দিয়েছিল। যাতে লোকটার ছটফটানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। একই কারণে বুকের ওপরে উঠে হাটুগেড়ে বসেছিল একজন অত্যন্ত নির্দয়ভাবে। এবং সে-ই ছিল প্রধান খুনী। আর সেইজন্যে মৃতদেহের শার্টের বোতামগুলো খোলা এবং এদিক সেদিক বিস্রস্ত, ছেঁড়া। তারপর, লোকটাকে সবাই মিলে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে ফেললে, প্রধান খুনী ঝুঁকে,

জলে-ডোবা মানুষকে যে ভঙ্গিতে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়, তেমনিভাবে হত্যাপর্ব সমাধা করেছিল।

কিছুক্ষণের ভেতরেই ভামিনীর চিল-চিৎকারে রেলষ্টেশনের কাছাকাছি এলাকায়, এখানে-সেখানে, ছোটখাটো কয়েকটা জটলার সৃষ্টি হল। একটা একেবারে অকুস্থলে। তবে সেই ভিড় পাতলা, ছেড়াখোঁড়া। আরেকটা প্ল্যাটফরমের উত্তরে রেলওয়ে চা ষ্টল থেকে ওধারের লেভেল ক্রসিং ছাপিয়ে বাজারের দিক পর্যন্ত। যেখানে গুঞ্জন এবং উদ্বেগটাই ছিল বেশি জায়গাটা অকুস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে।

বড়রকমের ভিড় চাঁক বাধলো ডাউন প্ল্যাটফরমের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে। যেখান থেকে লাশটা মাত্র শ'দুই গজ দূরে। এখানে জড়ো হয়েছিল নানান বয়স এবং চরিত্রের মানুষ। যারা যথার্থই কৌতূহলী। এবং অত্যুৎসাহীও বটে। এদের মধ্যে আছে কিছু প্রাতঃভ্রমণবিলাসীদের দল। কিছু মফঃস্বল যাত্রী। তাছাড়া, প্ল্যাটফরমের ফালতু লোক—। ভবঘুরে এবং বাউণ্ডুলের দল। উপরন্তু ছিল—থলি হাতে যারা বাজারে যাচ্ছিল, তারা।

বাঙালী স্বভাবে অনুমানপ্রিয় এবং বাক্‌পটু। স্বভাবতই সেখানে একটা সরস আলোচনাচক্র জমে উঠল।

একজন বলল, কি হয়েছে মশাই ?

প্রশ্নটা লক্ষহীন হলেও তৎক্ষণাৎ ভিড় থেকে উত্তরটা উঠে এল. খুন! মার্ডার—

প্রশ্নকর্তার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে উঠল, বলেন কি! একেবারে শেষ ?

কেউ একজন ফোঁড়ন কাটল, গিয়েই একবার দেখে আসুন না। যদি বেঁচে থাকে—

প্রশ্নকর্তা চটে গেল, আহা, আমি কি তা বলেছি—

বুড়োমতন একজন আত্মগত ডুকরে উঠল,-হরি হে, সবই তোমার লীলা! দেশটা কি একেবারেই উচ্ছন্নে গেল—

বুড়োর পাশেই মাঝবয়সী একজন দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে বাজারের থলি। সে কথাটাকে কেড়ে নিয়ে মাষ্টারী চালে বলল, খুব অবাক হচ্ছেন নাকি। আজকাল খুন তো আকছার হচ্ছে। খবরের কাগজ খুললেই—

বুড়ো হেঁচকি তুলল, হচ্ছে ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের এদিকে এখনো এসব হয়নি—

প্রথম বক্তা মাথা নাড়ল, ঠিক বলেছেন। আমরা এতকাল শান্তিতেই ছিলাম—

মাঝবয়সী ছিপি খুলে দেওয়া সোডার বোতলের মত ভসভসিয়ে উঠল, ছিলেন,—কিন্তু এখন থেকে আর নয়। একবার যখন শুরু হয়ে গেছে—

বুড়োর দুপাটি নকল দাঁত খটখটিয়ে উঠল. চুপ করুন তো। সকালবেলা যত অমঙ্গলের কথা—

মশার ঝাঁকের মত একঝাঁক ধমক মাঝবয়সীকে ছেঁকে ধরল। এটাই দস্তুর। সত্য অপ্রিয় হলে সেটাকে মনে মনে মেনে নিলেও কেউ সহজে মুখে করতে চায়না।

নিরুৎসাহ মাঝবয়সী মাষ্টারমশায়টি ভিড় থেকে কেটে পড়লে আলোচনার শূন্যস্থান পূরণ করল আরেকজন, তাজ্জব ব্যাপার! খুনটা হল কিসে? ছুরিতে না বোমায়—

সঙ্গে সঙ্গে জবাব মিলল, হার্টফেল করেছে—

প্রথমজন তেতে উঠল, তার মানে! আপনি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন?

দ্বিতীয়জন জিভ কেটে কথায় ভিয়েন চড়াল, তা কেন। হার্টফেল না করলে কি কেউ মরে? শুনছেন খুন হয়েছে। তবে সেটা ছুরি না পাইপগান না পেটোয় তা এতদূর থেকে জানব কি করে। আপনিও যেখানে আমরাও সেখানে। যতসব—

প্রসঙ্গ আরো খানিকটা হয়ত গড়াত। এমন সময় দেখা গেল

এক ছোকরা ওধারের প্ল্যাটফরম থেকে লাফিয়ে রেললাইনে নেমে এদিকে ছুটে আসছে। ওর পরণে খাটো মাপের কালোরঙের প্যাণ্ট। খালিগা। গায়ে একটা টার্কিশ তোয়ালে জড়ানো। মাংসল বুক। বোঝা গেল—কাছাকাছি কোন এক্সসারসাইজ ক্লাব থেকে ফিরছে। ছুই রেললাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভিড়ের দিে মুখ করে হাঁক পাড়ল, কি হয়েছে রে টনটন। ওখানে ঝুটম্ ভিড় কিসের?

এদিক থেকে টনটন নামধেয় তরুণটি চড়াগলায় উত্তর কর শিবমন্দিরের কাছে একটা মানুষ পড়ে আছে কেলো—

একলাফে এদিকের প্ল্যাটফরমে উঠে এল, বেঁচে আছে?

টনটন বলল, বোধহয় না।

কেলো ভিড়ের নিকটবর্তী হল। কপালে চোখ তুলে বলল বলিস কি রে! একেবারে শেষ। চল্ তো একবার দেখে আি গিয়ে—কেলোর কথা শেষ হল না। পাশ থেকে বুড়ো চিৎকা করে উঠল, ওদিকে আর তোকে যেতে হবে না।

কেলো পাশ ফিরে বুড়োকে দেখে চুপসে গেল। মিনমিনে গলায় বলল, দেখেই চলে আসব বাবা।

বুড়ো ছেলের ডানহাতখানা ধরে ফেলল, না। তোকে যেতে হবে না। বাড়িতে চল্—

কেলো তবু ঝাপটাল, কেন? দেখে আসলে কি হবে—

এক ভদ্রলোক বৃদ্ধকে সমর্থন করল, কি দরকার। তোমার বাবাই ঠিক কথা বলছেন। মার্ডার কেস। একটু বাদেই পুলিশ এসে পড়বে। ইয়ংম্যান তুমি। শেষটায় তোমাকে নিয়ে যদি টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দেয়—

'পুলিশ' শব্দটা বজ্রপাতের মত জটলাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল।

একজন উত্তেজিত গলায় বলল, দেখুন তো কি ঝামেলা খুন করার আর জায়গা পেলনা—

বোঝা গেল ভদ্রলোকের বাড়ি আশেপাশেই।

আলোচনা-চক্রটা আর রমরমা রইল না। সবাই কেমন শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। শেষটায়, অস্বস্তিটা কাটল প্ল্যাটফরমের লাগোয়া পুবদিকের রাস্তায় বঙ্কিম সরখেলকে আসতে দেখে।

সম্ভবত খুনের খবর পেয়েই তিনি এদিকে আসছিলেন। বঙ্কিম সরখেল এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার। রোগা, ঢ্যাঙা চেহারা। একটু কুজো হয়ে হাঁটেন। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বগলে মান্ধাতার আমলের চামড়ার ব্যাগ।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, ওই যে বঙ্কিমদা আসছেন—। বঙ্কিম সরখেল এ অঞ্চলের খুবই জনপ্রিয় সমাজসেবক।

দেখতে দেখতে জটলা প্ল্যাটফরম থেকে পাশের রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল।

দুঃসংবাদটা ওখান থেকেই ছড়িয়ে গিয়েছিল ষ্টেশনের উত্তর দিকে। আপ প্ল্যাটফরমের উত্তরে টিকিটঘর। টিকিটঘরের লাগোয়া রেলওয়ে চায়ের ষ্টল। সেখানে সংবাদটা এমুখ সেমুখ করে খানিকক্ষণ লাট খেল। তারপর সেটা আরো উত্তরে বাজারের দিকে ছড়িয়ে গেল। চায়ের ষ্টলের মালিক বিপিন তলাপাত্র; শোকেসের মাথায় সবুজ রঙের চৌকো টিনে সাদাকালিতে লেখা। ওই নামটুকু ছাড়া বিপিন তলাপাত্রকে স্বনামে চেনার কোন উপায় নেই। তিনি এই তল্লাটের বুড়োবাচ্চা সকলের সার্বজনীন মেজদা। ওই নামেই আজ পঁচিশ বছর হতে চলল এ অঞ্চলে তার পরিচয়। মানুষটি অমায়িক। সদাহাস্যময়। পরন্তু বেশ বুদ্ধিমান এবং সতর্ক।

সংবাদটা চায়ের ষ্টলে গিয়ে যখন পৌঁছুল তখন দুরন্ত এবং প্রত্যক্ষদর্শীর অতিরঞ্জিত বিবরণে আরো লোমহর্ষক হয়ে উঠল। চায়ের ষ্টলে প্রথম মুখ খুলল কালীপদ গড়াই। বাজারে মুড়ি-মুড়কী-চিঁড়ে-বাতাসার দোকান আছে তার। দশবছর হল মেজদার চায়ের ষ্টলের নিয়মিত প্রভাতী খদ্দের। বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারা। একটু বোকা ধরনের মানুষ। সে চায়ের কাপে ঠোঁট

ভিজিয়ে একহাট খদ্দেরের সামনে বোমা ফাটাল, শুনেছেন মেজদা, একটা লোক নাকি শিবমন্দিরের কাছে খুন হয়েছে?

মেজদা টিনের কৌটা থেকে পরিমাণমত মাখন ছুরির ডগায় তুলে রুটিতে মাখাছিল। কালীপদ গড়াইর কথাটা চাপা দেবার জন্যই সংক্ষেপে উত্তর করল, আমিও সেইরকম শুনলাম। সত্যি-মিথ্যে, কি জানি কি ব্যাপার—

একজন নিবিষ্টমনে কাগজ পড়ছিল। 'খুন' শব্দটা শুনেই সে মুখ তুলে 'কার সাপ' গোছের প্রশ্ন করে বসল, খুন, কে খুন হল?

মেজদা ক্যাকাশে হাসল। সকালের দিকে বাজার যাত্রীদের একটা বড় অংশ এখানে চা খেতে আসে। খুনের কথা চারিয়ে উঠলে কেউ আর চা, কেক, টোস্ট, বিস্কুট, ওমলেটের ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করবে না এই ভেবে বিরক্ত হল মনে মনে। বলল, কে জানে কোথাকার লোক। অতশত শুনি নি।

খবরের কাগজটা কোলের কাছে নামিয়ে প্রশ্নকর্তা নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল, না মানে—চেনাজানার মধ্যে কেউ না তো?

মেজদা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, কে ওসব খবর নিচ্ছে মশাই। সময় কই।

কালীপদ গড়াই উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে তার কানে জল ঢুকেছে। মেজদার সতর্ক প্রশ্নোত্তরের ধারাটা বুঝতে পেরে সে-ও তাতে সায় দিল, যা বলেছেন মেজদা। আমরা আদার ব্যাপারী। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত—

ধূমায়মান চায়ের মত প্রসঙ্গটা আস্তে আস্তে স্টলের এ টেবিল থেকে ও টেবিলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সতর্ক কালীপদ গড়াই বাজারের কাছে এসে মনে মনে খানিকটা দমে থাকলেও সংবাদটাকে পুরোপুরি হজম করতে পারল না। একে ওকে সংক্ষেপে বলতে শুরু করল।

লাশটার কাছাকাছি যারা ভিড় জমিয়েছিল তাদেরই প্রকৃত

সাহসী বলতে হবে। শিবমন্দির থেকে রেললাইন ধরে দক্ষিণে কয়েক কদম এগুলে ডাইনে বাঁয়ে দেখা যাবে রেললাইনের দুপাশের নয়ানজুলির ওপর সার সার মাচা বাধা খুপরী। দরমা-ক্যানেস্তারা প্লাইউডের ঘর। দূরের ডিসট্যান্ট সিগন্যাল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

কলকাতা শহরের আশপাশের রেলষ্টেশনের কাছাকাছি এ জাতীয় জবরদখল জনপদ প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়বে। স্থানীয় ভদ্রপল্লীর বাবুদের পরিভাষায় এগুলিকে বলা হয় রেলকলোনী।

লাশের নিকটবর্তী যারা ছিল তাদের বেশির ভাগই ওই রেল-কলোনীর বাসিন্দা। সব বয়সের মানুষ জড়ো হয়েছিল ওখানে। তাদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যে তেজী ছিল খালি গা হাত-পা কাঠি কাঠি ফ্যালনা বাচ্চা ছেলের দল। তারা ভোরবেলা রেল লাইনের ধারে একটা অভিনব বস্তুর সন্ধান পেয়ে খুবই কৌতুক বোধ করছিল।

বয়স্কদের মধ্যে মেয়েছেলেও ছিল। মানে রেলকলোনীর বউঝিরা। বাদবাকী কিছু নিষ্কর্মা লোক। এছাড়া এদিক সেদিক থেকে দুচারজন অসমসাহসী ভদ্রলোকও এসে ভিড় জমিয়েছিল।

বাচ্চা ছেলেগুলো ছিল সবচেয়ে নির্ভয়। ওরা লাশের খুব কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিল। কেউ কেউ একেবারে কাছে ঝুঁকে লাশের ক্ষতস্থান পরীক্ষায় তৎপর হয়ে পড়ছিল।

বউঝিরা, যারা মাতৃস্থানীয়া, এদের থেকে থেকে ওধারের রেললাইন থেকে ধমকে উঠছিল : 'এই বিপনে, এদিকে চলে আয় বলছি', 'হাবুল, ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস হাঁ করে নচ্ছার।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন, বয়স্ক, যার পায়ে হরিণের চটি হাতে সুদৃশ্য বেতের ছড়ি, সম্প্রতি ছানি কাটিয়েছেন বলে চোখে পুরুকাচের চশমা, সুবেশ, রেলকলোনীর একজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখো তো হে ভাল করে, লোকটাকে চিনতে পার কিনা—

উত্তরে লোকটা, আদুল গা, পরণে হাটু অবদি তোলা লালচে হয়ে আসা হালকা জমিনের ধুতি, দাঁতে নিমের ডাঁটি, সরল গলায় বলল, আজ্ঞে না। আমাদের কলোনীর কেউ বলে মনে হচ্ছে না।

উত্তর শুনে আরেক ভদ্রলোক দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, আচ্ছা আহাম্মক তো তুমি! তোমাদের বস্তীর কেউ না হলেও আমাদের পাড়ার কেউ তো হতে পারে। একবার এগিয়ে গিয়ে দেখেই এসোনা—

লোকটা জবাব দেবার আগে লাশের কাছাকাছি ওধারের লাইনে এক বুড়িকে দেখা গেল। মাথায় ছোট ছোট চুল, পাটের মত হলদেটে। চোখমুখের কুঞ্চনে অসংখ্য নদীনালা। পরণে শতছিন্ন একটা ন্যাকড়া। বুড়ি সঠিক কোথায় থাকে তা কেউ জানেনা। তবে প্রতিদিন ভোরবেলা ওকে রেলকলোনীর ওধারের ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের ওদিক থেকে আসতে দেখা যায়। বাঁহাতে একটা চলটে-ওঠা কলাইয়ের বাটি। ডান হাতে ধরা বাঁশের লাঠিটা দিয়ে বুড়ি গোল হয়ে আসা শরীরটা সামাল দিয়ে হাটে কোনমতে।

এদিকে ভিড় দেখে বুড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝাপসা গলায় শুধোল, কি হয়েছে গা? তোমরা সবাই এখানে ডেইরে কেন?

বুড়িকে শহরতলীর অনেকেই চেনে। বিশেষ করে ট্রেনের যাত্রীরা। ডাউন প্ল্যাটফরমের মাঝামাঝি রেলব্রীজের তলায় বুড়ি ভিক্ষে করে। একটা চৌকো শানবাধানো বেদীর ওপরে বসে। বিশ্রী চেঁচায়, হাত-পা ছোঁড়ে। কাঁদে-ককায়। কখনো বা শ্লেষ্মাধরা গলায় রামপ্রসাদের একটা মালসী ভাঙা ভাঙা গলায় গায়: 'ভাল নয় মা কোনকালে—'

সাদা দিনমান বুড়ি ওখানে বসে থাকে। সুর করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। বলে—দোহাই মা বাপ, দুটো পয়সা দিয়ে যা—

বুড়ির প্রশ্নের উত্তর দিল একটা বাচ্চা ছেলে, দেখছ মা, একটা মানুষ পড়ে আছে—

সেকথা শুনে বুড়ি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, আহা রে ! কার ঘরের ছেলে ?

তারপর লাশটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ফের বিলাপোক্তির মত বলতে লাগল, আহা ! কোন শত্তুর একাজ করল। সোনার চাঁদ ছেলে --

ওটা বুড়ির কথার লব্জ। যে কেউ তার দিকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলেই বলে, সোনার চাঁদ ছেলে। বেঁচে থাকো বাবা।

বেতের ছড়ি হাতে ধরা ভদ্রলোক ওধার থেকে গর্জন করে উঠলেন, এদিকে চলে এসো। সকালবেলা মরাকান্না জুড়ে দিলে যে ! যত আপদ—

বুড়ি কুঁই কুঁই করে আরো কয়েকটা কথা আউড়ে গেল। যা কারুরই বোধগম্য হল না। তারপর ফের চলতে শুরু করল। বেলা হয়ে গেলে রেলব্রীজের তলার নির্দিষ্ট শানবাধানো জায়গাটুকু বেদখল হয়ে যাবার সমূহ ভয় আছে। কেননা, দেশে ক্রমশই ভিখিরির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

লাশটাকে ছাড়িয়ে যাবার সময় ফের বুড়ির গলার আওয়াজ স্বচ্ছ হয়ে এল। সে নিজের মনেই বলে উঠল ঃ কোন বাড়ির ছেলে কে জানে।

প্রশ্নটা শুধু বুড়ির একার নয়। শহরতলীর সবারই। লোকটা কে ? এই অঞ্চলের কেউ কি। হলে কোন দিককার। এ পার না ওপারের। আর এইখানেই যত গণ্ডগোল। যত সংশয় সন্দেহ অনুমান।

কেননা, লাশটাকে সনাক্ত করার আগে ওর বয়সটা আন্দাজ করা দরকার। আর যেটা ঠাহর করে ওঠা সবচেয়ে মুস্কিল।

লাশের পরণে টেরিকটের জামা। ওয়াশ এ্যাণ্ড ওয়ারের খয়েরী রঙের প্যাণ্ট। বাঁহাতে কালোরঙের ডায়াল—চৌকো রিষ্টওয়াচ।

ডান হাতের কব্জিতে একটা লাল সুতো বাঁধা। হয়তো ঠাকুর দেবতার কাছে কোন ব্যাপারে মানসিক করেছিল মৃত মানুষটি। প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে রুমালের একদিকের কোণা বেরিয়ে আছে। রুমালের প্রান্তে সবুজ রঙের সুতোয় নক্সাকরা একটা ছোট ফুল। পায়ের হাওয়াই চটির একপাটি ছিটকে পড়ে আছে রেললাইনে। আরেক পাটি ডোবার জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। কণ্ঠনালীর গভীর ক্ষতের ওপরে-নিচে বলকে বলকে রক্ত ফেনিয়ে উঠে, শুকিয়ে এলেও, সুন্দর একটা রক্তের ফুল রচনা করেছে।

খোলাবুক এবং হাতের নগ্ন অংশে চোখ রাখলে বোঝা যায়—লোকটা লোমশ ছিল। শরীরে মাংসের চেয়ে হাড়ের ভাগ বেশি। প্যান্ট জামা কুচকে গেলেও অপরিচ্ছন্ন নয়।

হয়তো লোকটা উদাসীন কিংবা বেপরোয়া ছিল। মাথার চুল তেলের অভাবে রুক্ষ। বিবর্ণ। বুকখোলা জামার নিচে কোন গেঞ্জি নেই। শার্টের এখানে সেখানে সিগারেটের আগুন লেগে পুড়ে গোল গোল ফুটো হয়ে রয়েছে।

অনুমান অনেক দূর অব্দি পৌঁছুলেও একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। লোকটার বয়স কত। চল্লিশ না বাইশ। লাশটা কি কোন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের। অথবা কোন যুবকের। না কোন তরুণের। তবে একথা ঠিক—বয়স এদের মাঝখানেই লুকিয়ে আছে।

লাশটা ডাইনে সামান্য হেলে আছে। ফলে গোটা মুখটা নজরে আসে না। তারওপর ধ্বস্ত, বিকৃত মুখ। থ্যাতলানো চিবুক। মাথার চুলের অনেকটা কপাল ছাপিয়ে নিচের দিকে নেমে এসে সনাক্তকরণের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করছে।

লোকটা অথবা যুবকটি কিংবা ছেলেটা যে-ই হোক না কেন, যখন মৃত এবং নিহত, তখন আপাতত ওটাকে লাশ ভেবে নেওয়াটাই সঙ্গত হবে।

ভামিনীর আর কাজে যাওয়া হল না। লাশটাকে দেখার এবং সেকথা সকলকে জানিয়ে দেবার প্রাথমিক কৃতিত্বটুকু যেহেতু তারই, তাই সে সহজে নিস্তার পেল না।

যারা তার চিৎকারে লাশের আশেপাশে এসে জড়ো হয়েছিল তাদের নানান উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ভামিনীর মূল্যবান সময়ের অনেকটা খরচ হয়ে গেল। সকালের দিকে অফিসের তাড়া। সেই কারণে ছেলেকে সঙ্গে নেয় সে। দেরী হয়ে গেলে কাজ ঠিকমত সারতে পারেনা। গিন্নীরা মুখ ব্যাজার করে। তেতো মুখে কথা বলে। গিন্নীদের বকুনির ভয়েই ঘরে ফিরে এল ভামিনী।

ভামিনী রেলকলোনীর বাসিন্দা। শহরতলীর দক্ষিণে রেলকলোনী। চালের চোরা কারবারী রাজমিস্ত্রি কামিনকামলা চোর ছিন্তাইবাজ ঝি ঘরামি—হরেক রকম পেশার নরনারী এখানে থাকে। এদের সঙ্গে শহরতলীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

হরেন পয়রা ভামিনীর স্বামী। পেশায় ছুতোর। খুপরীর সামনের কাঠের পাটাতনে বসে জলচৌকির পায়া তৈরী করছিল। অসময়ে ভামিনীকে ফিরে আসতে দেখে শুধোল, কি ব্যাপার, কাজে গেলে না?

ভামিনী জানত হরেন এরকম প্রশ্নই করবে। আজকাল কামাই করলে হরেন জোর বকুনি দেয়। আগে অন্যরকম ছিল হরেন। বউকে নেহাৎ প্রয়োজন না ঘটলে ঘরের বাইরে বেরুতে দিত না। রেলে ডানপায়ের অর্ধেকটা খোয়া যাবার পর থেকেই হরেন ভামিনীর প্রতি নির্দয় হতে শুরু করেছে। আগে হরেনের যথেষ্ট আয় ছিল। পাকা কাঠমিস্ত্রি। ফুরনে বড় বড় কাজ ধরত। এখন ঘরে বসে সস্তার কাঠ দিয়ে টুকটাক চেয়ার-টেবিল-মিটসেফ জলচৌকি বানায়। বিকেলের দিকে ভামিনী আর ছেলে সে সব

জিনিস নিয়ে বাজারে যায়। রেডিমেড মাল। খেলো জিনিস। যে-দামে বিক্রি হয় তাতে খরচখরচা বাদ দিয়ে লাভ কিছুই থাকে না। তাই, ভামিনীর আয়ের টাকাটা এখন সংসারের পক্ষে একান্তই জরুরী। ভামিনী কামাই করলে বাবুরা ছাড়ে না। মাইনে কাটে হিসেব করে।

ভামিনী রা কাড়বার আগেই ছেলে নিতাই ছুটে এল হরেনের কাছে। গালগলিয়ে উঠল, জানো বাবা, শিবমন্দিরের কাছে একটা মানুষ খুন হয়েছে।

হরেন পয়রা স্বভাবে ভিতু। ছেলের কথায় তার হাতের বাটালিটা পাটাতনে পড়ে গেল, সে কি, খুন? এই সকালবেলায়—ভামিনীর বুকের ভার হাল্কা হল। বুঝল, কামাইয়ের জন্যে আজ আর বকুনি খেতে হবেনা। নিশ্চিন্ত গলায় বলল, আজ হতে যাবে কেন। খুন হয়েছে কাল রাত্তিরে—

পাশের ঘর সুদাম বৈরাগীর। একটা মস্ত বেড়ার ঘর। মাঝখানে পার্টিশন। সামনে এক চিলতে দাওয়া। দাওয়ায় বসে বৈরাগী তামাক টানছিল। নিবিষ্টমনে। ওদের উত্তেজিত কথা-বার্তায় চটকা কেটে গেল। গলা পরিষ্কার করে বলল, কি হয়েছে ছুতোরের পো?

হরেন বাটালীটা তুলে নিল, আর বলো কেন বৈরাগীঠাকুর। শিবমন্দিরের কাছে একটা লোক নাকি খুন হয়েছে—

সুদাম চোখ বুজল। নীরব থেকে সংবাদটাকে মগজের ভেতরে চালান করে দিয়ে হুকোয় টান দিল ফের। ধোঁয়া ছাড়ল কিছুটা। খানিকটা গিলল। তারপর বলল উদাস সুরে, বুঝলে ছুতো[illegible] পো, বসুমতী আর পাপ সইতে পারছেনা। ঘোর কলি। ক[illegible]ল কালে আরো কত কি যে হবে—

বৈরাগীর কথাবার্তাই ওইধারার। সব কিছুকে বড় পরিপ্রেক্ষিতে দেখার প্রবণতা ওর স্বভাবজাত। ওদের কথাবার্তায় উত্তরের ঘর থেকে ছিট-বেড়ার আগল ঠেলে বেরিয়ে এল টগর। এলোমেলো

বেশবাস। ছপা টলছে। কালরাতে বড্ড বাড়াবাড়ি করেছিল টগর। হাতের তালু দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে টগর সুদামকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে গো ঠাকুর—

বৈরাগী তাকাল টগরের দিকে। চোখের কোণে ঘন হয়ে কালি জমেছে টগরের। বুকের কাপড় উদলা।

বৈরাগী কত বোঝায়ঃ শান্ত হও টগর। বাসনাকে সংযত করো। নইলে শোটায় পস্তাবে। রসাতলের পথ বড়ই পিছল—

কিন্তু কে কার কথা শোনে।

টগরের রক্তে পঁচিশটা বসন্তের মত্ততা ফুঁসে ওঠে, তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ ঠাকুর! পাপপুন্যের ধার ধারিনা আমি। যা হবার তা হবে। একবারের বেশি ছবার তো আর মরব না।

বৈরাগী যুক্তির আশ্রয় নেয়ঃ ও কথা বোলোনা টগর। জীবনের একটা মস্ত দাম আছে। অনেক পুন্যের ফল এই মানব জন্ম। একে হেলাফেলায় নষ্ট করা উচিত নয়।

টগর হিক্কা তুলে হাসে খিলখিলিয়ে। ঢলে পড়ে বৈরাগীর গায়। অঙ্গ কাঁপিয়ে গান ধরে,

'জ্বেলে আগুন পালিয়ে গেলি নিভায়ে গেলি নারে কালা।
ভাঙা তরী ডুবায়ে দিলি ধর্ম রাখলি নারে কালা ॥'

টগরের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুদাম থতমত খায়। উচ্ছৃংখলতার চরমে নেমে গিয়ে টগর মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলছে দিনে। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সুদাম দায়-সারা বলে, কি জানি কোথায় নাকি একটা লাশ পড়ে আছে—

সুদামের কথা শেষ না হতে লাফিয়ে দাওয়ায় নেমে আসে টগর। প্রশ্ন করে, লাশ, কার লাশ?

সুদাম হুঁকোয় টান দেয়, কে জানে কার—

টগর তেতে ওঠে, তোমার ওই একধারার কথা ঠাকুর। কোন

কথা খোলসা করে বলো না। —তারপর বুকের কাপড় ঠিক করে নিয়ে হরেনকে শুধোয়, তুমি কিছু জানো হরেনদা ?

হরেন ফ্যাকাসে হাসে, নাহ্। শুনলাম শিবমন্দিরের কাছে নাকি একটা মানুষ পড়ে আছে—

ভামিনী মাথার ঘোমটা নাকের ডগা পর্যন্ত টেনে দেয়। টগরের সঙ্গে ওর বরাবরের অসদ্ভাব। স্বভাবচরিত্র ভাল নয় টগরের। ভামিনী দুচক্ষে দেখতে পারে না টগরকে। অনেক দিন ধরেই দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ।

রেললাইনে লোকজনের চলাচল বেড়েছে। বেশির ভাগ ছুটছে উত্তরমুখো। সম্ভবত, মানুষ খুন হবার সংবাদ পেয়েই এগুচ্ছে সব। জগাও ছুটছিল। জগা তারকাটা পার্টির লোক। রেলকলোনীর এই সব অসামাজিক লোকেদের সঙ্গে টগরের খুব দোস্তালি।

ঘরে থেকে লাশটার বিষয় নতুন কোন তথ্য আর জানা সম্ভব হবে না জেনেই টগর হাঁক পেড়ে জগাকে দাঁড় করাল, এই জগা দাঁড়া, আমি আসছি—

সুদাম হাঁ হাঁ করে উঠল, কোথায় চললে ?

টগর ততক্ষণে রেললাইনে উঠে গেছে। বলল চেঁচিয়ে, এক্ষুণি আসছি ঠাকুর—

মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে। ভেজা ভেজা দমকা হাওয়াট জুড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ হল। রোদ কোমল হয়ে ফুটে উঠেছে সুদামের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে উঠেছে সেই কোন সকালে তখনো আলো ফোটেনি। পাশের ঘরে টগরের তখন মধ্যরাত এতক্ষণ হাঁ করে বসেছিল। কখন টগর ওঠে। একবাটি চা না হলে সকালের দিকটা মাটি মাটি লাগে সুদামের।

টগর বেরিয়ে যেতেই উত্তরের ঘর থেকে মুরগীটা ডানা দা

নেমে এল দাওয়ায়। 'ককর কক্' করে বারকয়েক বিশ্রি ডেকে উঠল। রাগে বৈরাগীর সারা গা রি-রি করে উঠল।

টগরের পোষা মুরগী। মাসখানেক আগে কোত্থেকে নিয়ে এসেছিল। সারাদিন ঘরবাড়ি নোংরা করে। বিশ্রি চেঁচায়। অথচ এ নিয়ে কিছু বলা চলবে না টগরকে। বললেই তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে তোলে।

সুদাম বলে, যতসব ম্লেচ্ছ ব্যাপার। গেরস্থ বাড়িতে এসব অনাচার—

সঙ্গে সঙ্গে ধারালো জবাব দেয় টগর, গেরস্থবাড়ি! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ঠাকুর?

নিজেব কথাটাকে সংশোধন করে বলে বৈরাগী, ঠাট্টা করব কেন? আমি বলছিলাম জাতধর্ম বলে তো একটা কথা আছে—

টগরের কথায় লাগাম থাকে না, আমার আবার জাতধর্ম। বারো জাতের মানুষ আসছে ঘরে। তাতে অনাচার হচ্ছে না? না পোষালে তুমি তোমার পথ দ্যাখো ঠাকুর। আমি তো আর তোমাকে আটকে রাখিনি—

কথাটা ষোলআনা সত্যি। সুদাম বৈরাগী টগরের ঘরে এসেছিল স্বেচ্ছায়।

চিরকালের বাউণ্ডুলে সুদাম। কত ঘাটে আঘাটায় ঘুরে ঘুরে সে কাটিয়েছে। পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে, যখন পাকাপোক্ত ভাবে বিবাগী হয়ে যাওয়ার কথা,—তখন সে টগরের পেছু নিয়েছিল। সেটা আজ বছর দেড়েক আগের কথা। দুজনের আলাপ-পরিচয়টা ঘটেছিল এক রেলষ্টেশনে। ডায়মণ্ডহারবার লাইনের এক অজ পাড়া গাঁ জায়গাটা। তখন টগর চালের চোরা কারবার করত। সুদাম সেখানে গিয়েছিল অন্য কারণে। ওই রেলষ্টেশন থেকে ক্রোশ খানেক পূবে শীতকালে এক মেলা বসে। সেই মেলায় বহু বৈরাগী-বাউল-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। তাদের সঙ্গ-লাভের আসায় গিয়েছিল সুদাম বৈরাগী। তিনটে দিন এ

আখড়ায় সে আখড়ায় কাটিয়ে—গানবাজনা করে এসেছিল রাতের দিকে ষ্টেশনে ট্রেন ধরতে। টগরও ছিল তখন সেই ষ্টেশনেই। একই প্ল্যাটফরমে। দুজনেই লাষ্টট্রেন ফেল করে। তখন সুদাম অন্যমানুষ। পুরোদস্তুর বৈরাগী। পরণে গেরুয়াবস্ত্র। মুখময় গোঁফ দাড়ি। লম্বা দীঘল চুলে জট। গলায় তুলসীর মালা। কপাল থেকে নাকের ডগা অব্দি রসকলি আঁকা। হাতে গোপীযন্ত্র। মুখে হরিনাম।

দুজনে বসেছিল একই বেঞ্চে। ভোরের অপেক্ষায়। টগরের সঙ্গে চালের বস্তা। পাশাপাশি এক বেঞ্চে দুটি প্রাণী। আলাপ জমে গিয়েছিল অল্পক্ষণের ভেতরেই। বেজায় মশার উৎপাত। তার ওপর চারদিকে খোলা মাঠ। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। সেদিন রাতে কারুরই ঘুম হয়নি।

পুরো একটা রাত। কম সময় নয়। কথা বলতে বলতে টগরের ব্যাপারে সুদাম বৈরাগীর কৌতূহল ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল। অথচ, যেটা হবার কথা নয়। সংসার সম্বন্ধে বীতস্পৃহ সুদাম। শাস্ত্রে আছে—বৈরাগীর গৃহীমানুষের সুঃখদুঃখের কথা শোনা বারণ। পঁচিশ বছর সে ঘরছাড়া। তিনরাতের বেশি সুদাম বৈরাগী এক ছাউনির নিচে কাটায় নি। অনেক লোভ-প্রলোভন জয় করা মানুষ সে। তবু সে রাতে ধীরে ধীরে টগরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সেটা দেহের আকর্ষণ নয়। মনের দিক থেকে আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হয়ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সুদাম। সেটাই প্রধান কারণ।

কথায় কথায় এক সময় টগর বলেছিল, এভাবে এদিক সেদিকে লাট খেয়ে কদিন চলবে ঠাকুর। তার চেয়ে চলো না আমার ঘরে। অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে—

সুদাম কৌতুক করেই বলেছিল, সে কি গো। কপালে তো দেখছি মস্ত সিঁদুরের টিপ। তোমার পিছু নিলে তোমার পতিদেবতাটি কি আমাকে ভাল চোখে দেখবে?

টগর হেসেছিল, এই ভয় তোমার। না, তাতে কিছু অসুবিধে হবে না। এঁয়োতি বটে আমি। কিন্তু সোয়ামী নেই ঘরে। সে কবে পালিয়েছে—

সুদাম স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতির সুরে বলেছিল, আহা, বড়ই কপাল মন্দ দেখছি তোমার। তা তিনি হঠাৎ পালিয়ে গেলেন কেন ?

টগর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, সে এক-কাহন কথা। তবে গেছে ভালই হয়েছে। বেশ আছি এখন—

সুদাম ভারিক্কি চালে বলেছিল, ছি, ওকথা বলতে হয় কখনো। পতি ছাড়া যে সতীর গতি নেই গো—

টগরের কণ্ঠস্বরে উষ্মা উপচে উঠেছিল, পতি না ছাই, ভাত-কাপড়ের যোগান দেবার নাম নেই কিলোবার গোসাই—

সুদামের কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল টগরের কথায়, তার মানে ? খুলেই বলো না—

টগর বলেছিল, খুলে বলার কি আছে। আমায় নিয়ে মন ভরল না, মানুষটা নতুন মাগী জোগাড় করল একদিন। তারপর সেটার হাত ধরে চলে গেল,—এই আর কি ?

সুদামের কথায় সান্ত্বনা ঝরে পড়ল, আহা সত্যি মন্দ কপাল তোমার। তা লোকটা কোথায় গেল জানো কিছু ?

টগর বলেছিল, জানব না কেন। কালীঘাটের দিকে এক বস্তীতে গিয়ে উঠেছে—

টগরের ব্যাপারে সুদাম ক্রমশ মনোযোগী হয়ে উঠেছিল, যখন জানো তখন যাও না কেন লোকটার কাছে। বুঝিয়ে বলো না। তাছাড়া নিজের দাবীই বা কেন ছেড়ে দেবে। তুমি তো তার বিয়ে-করা বউ—

টগর অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, বিয়ে-করা না বলে বলো পয়সা দিয়ে কেনা মেয়ে মানুষ—

বৈরাগী প্রশ্ন করেছিল, তার মানে ?

টগর চাঁছাছোলা উত্তর করেছিল, লোকটার স্বভাবচরিত্তির কোনকালেই ভাল ছিল না। সব জেনেশুনেও বাবা তিনকুড়ি টাকা নিয়ে ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল আমার। পয়সা দিয়ে কেনা মেয়েমানুষকে কেউ আপন ভাবে?

বৈরাগী হায় হায় করে উঠেছিল, সে কি কথা! বাবা হয়ে এতবড় সর্বনাশটা করল মেয়ের—

টগর ধমকে উঠেছিল, সংসারের তুমি কি বুঝবে ঠাকুর। ছেলেবেলায় আমার মা মরল। বাবা আবার বিয়ে করল। ছেলেপুলে হতে লাগল। তারপর কি আর বাপের আমার ওপর টান ভালবাসা থাকে? বিদেয় করতে পারলে বাঁচে।

সুদাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, সবই লীলাময়ের খেলা। তবু, তুমি একবার দেখা করলে পারতে সোয়ামীর সঙ্গে। হাজার হলেও তুমি তার ধর্ম্মপত্নী।

টগর মুখিয়ে উঠেছিল, যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। আমার সোয়ামী সে পাত্তর নয়।

মানুষটার শরীরে দয়ামায়া বলে কোন পদার্থ ছিল না। মানুষটা আমার শরীরটাকেই সার চিনেছিল। বিয়ের পর কিছুদিন আদর-সোহাগও করেছিল। তারপর, চোখ থেকে ঘোর কেটে যেতেই ঘরে লোকজন জুটিয়ে আনতে শুরু করল। আমি প্রথম প্রথম আপত্তি করতাম। কিন্তু, ওরা ছেড়ে কথা কইবে কেন। এসেছে টাকা ঢেলে ফুর্তি করতে। তাছাড়া, সোয়ামীও যে ওদের দলে। শেষমেষ লোকটা ছেড়ে গেল আমাকে। নতুন মাগী পেল। সেই মানুষের কাছে কি আর ফিরে যাওয়া যায় ঠাকুর! বলতে বলতে টগরের কথাগুলো কান্নার মত সুরেলা হয়ে উঠেছিল।

নির্জন প্ল্যাটফরম। পেছনের মাঠ থেকে হু-হু করে ছুটে আসা শীতের দাঁতাল বাতাস। মধ্যরাত শব্দহীন। টগরের জীবনকাহিনী শুনতে শুনতে সুদাম বৈরাগীর মন স্মৃতির চড়ায় ঠেকে যাচ্ছিল বারবার। পুরোন দিনের নানা কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।
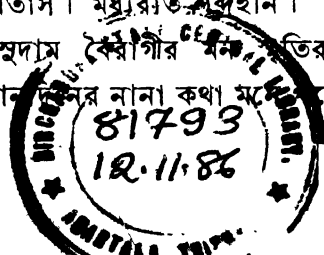
কতকাল আগেকার কথা। ছাব্বিশ সাতাশ তো হবেই। বিয়ের পর তরঙ্গ পুরো একটা বছরও ঘরে থাকে নি। শিকল কেটে পালিয়েছিল। পালাধড়কি হয়েছিল তরঙ্গ। এখনো ঝাপসা তরঙ্গর মুখটা চোখের সামনে ভাসে। সবই নিয়তির মার। যে দুঃখে টগর জ্বলছে সেই দুঃখে একদিন সুদামও জ্বলেছে। তফাৎটা এই টগর এখনো ছাউনির তলায় আছে। আর সুদাম বৈরাগী। সব ছেড়ে দিয়েছে। গ্রাম, পরিচিত লোকের সঙ্গ, চেনা পৃথিবী সব। হাল সাকিন মুছে দিয়ে বৈরাগীর ধরাচূড়ো পরেছে। বৈরাগী তার উপাধি নয়। অথচ, তার পরিচয়ের সঙ্গে বৈরাগী উপাধিটা সেঁটে গিয়েছে অনেককাল হল।

চাদর মুড়ি দিয়ে হাত পা গুটিয়ে জবুথবু বসে সেই রাতে আরেক-বার ভাবতে চেষ্টা করেছিল সুদাম বৈরাগী। তরঙ্গ পালাধড়কি হয়েছিল কেন। কেন ঘুমন্ত সুদামের পাশ থেকে উঠে এক বর্ষার রাতে চিরদিনের মত নিরুদ্দেশ হয়েছিল তরঙ্গ। আগে কখনো যে সুদামের মনে সন্দেহ জাগেনি তা নয়। তবে, তরঙ্গের ওপর তার বিশ্বাস ছিল অগাধ। তরঙ্গ যে ঘর ছাড়বে এতটা ভাবতে পারে নি। বিয়ের আগে তরঙ্গর ভালবাসাবাসি ছিল একজনের সঙ্গে। কি যেন নাম ছোকরার। ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতর ব্যথার পাহাড় জেগে ওঠে। নিতাই যতীন কিংবা গোপাল। কতবছর আগের কথা। ঠিক মনে পড়ে না। জ্ঞাতিসম্পর্কে তরঙ্গের ভাই। ছিপছিপে শ্যামলা চেহারা। গ্রামের ইস্কুলে লেখাপড়া করেছিল কিছুকাল।

প্রায়ই নানান অছিলায় ছোকরা আসত সুদামের বাড়িতে। বাড়ি থেকে সুদামের শ্বশুরবাড়ি খুব একটা দূরের রাস্তা নয়। হাঁটাপথে ঘণ্টাতিনেক। সম্পর্কে সুমুন্দি। সাদামনে কাদা ছিল না সুদামের। ছোকরা এলে আদর-আপ্যায়ন করত। এলে দু'একদিন থেকে যেত ছোকরা। সুদাম দিনমানে ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। সারাদিন ছোকরার সঙ্গে তরঙ্গ কি করত বা না করত কিছুই সুদামের টের পাবার কথা নয়।

মাঝে মাঝে আড়ালে ডেকে মা সুদামকে সাবধান করত। বলত, ভাল বুঝছি না সুদাম। ছেলেটা বড্ড বাড়াবাড়ি করে। বউকে শাসন কর্। নইলে, একটা কিছু ঘটে গেলে কেলেঙ্কারীর আর শেষ থাকবে না।—মার কথা সুদাম কানে তোলেনি। সে তখন তরঙ্গর রূপযৌবনে হাবুডুবু খাচ্ছে।

তরঙ্গ চলে যাবার পরেও আশায় বুক বেঁধেছিল সুদাম। তার বিশ্বাস ছিল: একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে তরঙ্গ। ফিরে আসবেই। তখন, আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে ঘরে তুলবে তরঙ্গকে।

কিন্তু তরঙ্গ ফেরে নি। ফিরে আসার সুযোগ পায় নি। ছোকরা তরঙ্গকে নিয়ে নিজেদের গ্রামে ঢুকতে পারে নি। গিয়েছিল গঞ্জের দিকে। কদিন তরঙ্গকে নিয়ে বাসা বেঁধেছিল। তারপর, যেমনটা হয়। রক্তের স্রোত উল্টো বইতে শুরু করলে তরঙ্গকে ছেড়ে সরে পড়েছিল। এইটুকু পর্যন্ত খবর রাখে সুদাম। তারপর তরঙ্গর কি হল। কেউ কোন সঠিক খবর দিতে পারেনি। সুদাম ঘর ছেড়ে হাটে গঞ্জে আগলবাগল কিছুকাল ঘুরে বেরিয়েছে। যদি তরঙ্গর দেখা মেলে।

হয়নি দেখা। কেউ বলেছে, শহরের দিকে চলে গেছে। কেউ বলেছে বেবুশ্যে হয়ে গেছে। কেউ আবার বলেছে, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে তরঙ্গ।

ঘটনা যাই ঘটুক—সুদাম আর ফিরে আসেনি সাতপুরুষের ভিটেয়। লোকমুখে খবর পেয়েছে—বুড়িমা ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছে। তারপর, একদিন মারা গেছে।

মার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষনের টানটাই লোপ পেয়ে গেছে সুদামের জীবন থেকে। এখানে সেখানে লাট খেতে খেতে সুদামের মনের খোলনলচে পাল্টে গেছে একদিন। তারপর, পরণে গেরুয়া বস্ত্র, একমুখ দাড়িগোঁফ, চুলে জটা, হাতে গোপীযন্ত্র, মুখে হরিনাম—সুদামচন্দ্র একদিন সুদাম বৈরাগী বনে

গেছে। ছেঁড়া কাপড়ের মত পরিচিত জীবনটাকে বাতিল করে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে সে।.........

কিগো, চুপ মেরে গেলে যে বড়। যা ঠাণ্ডা। আজ আর ঘুম আসবে না। দুটো কথা কও। সময়টা কেটে যায় তাহলে,—ওপাশ থেকে টগর বলে উঠতে সুদাম বৈরাগীর চটকা ভেঙে গিয়েছিল।

নিশুতি রাত। শিশিরে কুয়াশায় অন্ধকারে দূরের জগৎ রহস্যময়।

কাশি-ভাঙা গলায় বৈরাগী প্রশ্ন করেছিল, তোমার কি ছেলে-পুলে হয়েছিল?

চালের বস্তায় মাথা হেলিয়ে হাটু ভেঙে আধশোয়া হয়েছিল টগর। উত্তরে বলেছিল, হ্যাঁ। হয়েছিল একটা ছেলে। এখন নেই। গতবর্ষায় সে শত্তুরও পালিয়েছে—

টগরের কণ্ঠস্বর বৈরাগীর কানে কাঁটার মত বিঁধেছিল। সে জিজ্ঞেস করেছিল, তার মানে! ছেলেটা আবার কোথায় গেল?

টগর অনিচ্ছার সঙ্গে উত্তর করেছিল, বাপ ঘর ছাড়ার পর সে ব্যাটাও সরে পড়েছিল—

টগরের বিবৃতিতে হেঁয়ালি ছিল। তাতে বৈরাগীর কৌতূহল আরো বেড়ে গিয়েছিল, এখনও বুঝলাম না। খোলসা করে বলো না—

কুয়াশা ঢেকে দিয়েছিল টগরকে। নইলে, দেখতে পেত বৈরাগী টগরের দুচোখ আর্দ্র। টগর বলেছিল কান্নাভেজা গলায়, আমাকে সেদিন যে কি মরণ ঘুমে পেয়েছিল ঠাকুর। মাঝরাতে পাশ ফিরতে দেখি ছেলে নেই পাশে। অন্ধকারে প্রথম এদিক সেদিক হাতড়ালাম। তারপর কুপি জ্বাললাম। বৃষ্টি হচ্ছিল জোর। ছেলেকে ঘরে খুঁজে পেলাম না। চিৎকার করতে লাগলাম। কিন্তু, সেই বৃষ্টির রাতে কে শুনবে আমার কথা—

বৈরাগীর রোখ্ চেপে গিয়েছিল সেদিন। অথচ, সেটা হবার

কথা নয়। সংসারী মানুষের সুখদুঃখের কথায় কান দেওয়া অধর্ম। তবু, এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বৈরাগীকে উতলা করে তুলেছিল।

শূন্য প্ল্যাটফরম। শুধু সে আর টগর জাগ্রত। টগরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুদাম বৈরাগী যেন পুরোণ পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছিল। স্বপ্নে মানুষ যেমন দূর অতীতে চলে যায়।

বৈরাগী শুধিয়েছিল, ছেলেটা তবে গেল কোথায়?

কাজল আকার ভঙ্গীতে চোখের নিচের পাতা থেকে আঙুল দিয়ে আলতো করে জল তুলে নিতে নিতে টগর বলেছিল, বাঁশের মাচার ওপরে ঘর। ছেলেটা ঘুমের মধ্যে গড়াতে গড়াতে কখন একবারে ধারে চলে গিয়েছিল। তারপর, টুপ করে পড়ে গিয়েছিল নিচের নালায়। বর্ষার জলে নালা থইথই করছিল। স্রোত ছিল ভীষণ। সেইটানে ছেলেটা চলে গিয়েছিল অনেক দূরে। পরের দিন সকালে খোঁজ পেয়েছিলাম। দশবারোটা ঘর ছাড়িয়ে ছেলেটা একজনার ঘরের খুঁটিতে আটকে ছিল—।—বলতে বলতে টগরের শরীরে বৃষ্টির ঢল নেমেছিল।

বৈরাগীর প্রশ্নের শেষ ছিল না, ছেলেটার তখন বয়স কত?

টগরের কণ্ঠস্বর ঝাপসা হয়ে উঠেছিল, তিনবছরের মত।

সে-কথায় বৈরাগী অন্যমানুষ হয়ে উঠেছিল। রিপু প্রবল হয়ে উঠেছিল তার শরীরে। ক্রোধে ফেটে পড়ে বলেছিল, লোকটা এতবড় পাষণ্ড! দুধের বাচ্চা ছেলেটাকে ফেলে—

টগরের কান্না হাসি হয়ে ঝরে পড়েছিল, এরকম বুদ্ধি না হলে আর তুমি বৈরাগী হবে কেন ঠাকুর? ছেলেটাকে পেটে ধরেছিলাম বলেই তো ওর যত রাগ আমার ওপর। নইলে, মানুষটা হয়ত আরো কিছুদিন ঘরে থাকত।

টগরের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে বলেছিল বৈরাগী, এতো বড় তাজ্জব কথা। ছেলে হওয়ায় লোকটা ঘর ছাড়বে কেন? তোমার ওপর না হয় ভালবাসা না-ই থাকল। কিন্তু হাজার হোক, নিজের সন্তান, তাকে ফেলে—

টগরের ভেতর থেকে এক সাপিনী বেরিয়ে এসেছিল সে-কথায়, সন্তান-টন্তান নিয়ে মাথা ঘামাতে ওর বয়েই গেছে। লোকটা অমানুষ। আমাকে ভালবাসলে তবেই তো আমার পেটেরটাকে বাসবে।

বৈরাগী হাটুরের মত প্রশ্ন করেছিল, তা না হয় মানলাম। কিন্তু, ছেলে হওয়ায় লোকটা বিগড়ে গেল কেন ?

টগর তীক্ষ্ণ গলায় বলেছিল, বিগড়াবেই তো। ছেলেটা যে আমার শরীরের ওপর ভাগ বসিয়েছিল। মানুষটার লোভ ছিল তো আমার শরীরটার ওপরেই—

সুদাম বৈরাগীর বুকের ভেতর একখণ্ড নরম মাটি জেগে উঠছিল টগরের প্রতি সমবেদনায়।

রাত তখন অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। টগর আর কথা বাড়ায় নি। কোলকুঁজো মেরে শাড়ির আঁচলে শরীর ঢেকেঢুকে চুপচাপ পড়েছিল টগর।

সেদিন বাকী রাতটুকু আর সুদাম বৈরাগীর ঘুম হয়নি। তার মাথার ভেতরে বাইরের ক্ষয়ে আসা অন্ধকার রাতটা সেঁধিয়ে গিয়েছিল। অনেক কিছু ভাবছিল বৈরাগী। নিজের ফেলে আসা জীবনের কথা। টগরের দুঃখময় জীবনের কথা। বুকের মধ্যে তখন খেলা করছিল এক রহস্যময় বেদনা। পঁচিশবছর ধরে আগলবাগল ঘুরে বেড়ানো পাগলা বৈরাগী একটু একটু করে পালটে যাচ্ছিল।

একসময় পাখ্‌পাখালির শব্দে রাতের অন্ধকার ঝরে পড়তে সুদাম বৈরাগী গৃহীমানুষের মত চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। চোখের সামনে আলো ফুটে উঠছিল ধ্যানের মত। বুনোফুলের ফুটে-ওঠা সুবাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠছিল বৈরাগী। আর সেই সঙ্গে নিকটের জলজ প্রাকৃতিক গন্ধ জড়ানো ঠাণ্ডা প্রভাতী হাওয়া এসে চন্দনের মত বৈরাগীর দেহে আছড়ে পড়ছিল। মাঠের প্রান্তে ডিমফাটা লাল কুসুমের মত সূর্য উঁকি মারতে শুরু করলে আর স্থির থাকতে

পারেনি সুদাম। দুচোখ জলে ঝাপসা হয়ে এসেছিল। কতকাল বাদে নিজের কথা ভেবে বৈরাগী নীরবে অশ্রুপাত করেছিল। এক সময় গোপীযন্ত্রটা হাতে তুলে নিয়ে সে গুণগুণ করে উঠেছিল,—

'ত্যজি ঘুমঘোর, উঠ মনচোর, নিশি হল ভোর, উঠ রাই।
যাও কোমল আঁখি, যাও বিধুমুখী, ডাকিতেছে পাখি—
আর রাতি নাই...'

সাইডিং থেকে সকালের ট্রেন প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াতে গান থেমে গিয়েছিল বৈরাগীর। টগর তখন ঘুমে অচেতন। সুদাম বৈরাগী উঠে ওর শিয়রের কাছে এসে কোমল গলায় ডেকেছিল, শুনছ। উঠবে না।

টগর হুড়মুড়িয়ে উঠে বসেছিল। গায়ের কাপড় ঠিক করে নিয়ে বলেছিল, ইস্, কখন ভোর হয়ে গেছে। কিছুই টের পাইনি—

টগর তখন বৈরাগীর চোখে চোখ রাখলে দেখত—দীঘির জলে কাঁপনলাগা ঢেউয়ের মত সুন্দর বৈরাগীর চোখের তারা আনন্দে কেঁপে উঠছে।

টগর নেমে সাততাড়াতাড়ি চালের বস্তাটা বাঁ কাখে নিয়ে ছোট্ট ছেলেকে জড়ানোর ভঙ্গীতে আঁচল দিয়ে সেটাকে ঢেকে একটা হাই তুলে বলেছিল, সারারাত তুমি ঘুমোওনি মনে হচ্ছে ঠাকুর!

সুদামের হাসিতে মমতা ঝরে পড়ছিল, হ্যাঁ, বসেই ছিলাম সারাক্ষণ। ঘুম আসেনি—

টগর ব্যস্ততার সঙ্গে বলেছিল, আজকের মত চলি ঠাকুর। আবার কোনদিন হয়ত দেখা হয়ে যাবে?

সুদাম বৈরাগী অকম্প গলায় বলেছিল, একলা যাবে কি! আমাকে সঙ্গে নেবে না?

টগর বৈরাগীর অভিপ্রায়টা ধরতে না পেরে বলেছিল, তুমিও কি কলকাতার দিকে যাবে নাকি?

সুদাম বৈরাগী হেসেছিল, তাতো জানি না। তুমি যেখানে যাবে আমিও তো সেইখানেই যাব—

টগর মুহূর্তের জন্য ছবি হয়ে গিয়েছিল। শুধু তার বাক্‌যন্ত্র সজীব ছিল, সত্যি বলছ ঠাকুর! আমার সঙ্গে যাবে?

সুদাম বৈরাগী রঙ্গ করতে চেয়েছিল, না গিয়ে আর উপায় কি বলো। তুমি একলা মানুষ। আমি একলা। তোমার সঙ্গেই তো আমার ভাল জমবে—

টগরের নিজের চক্ষুকর্ণের ওপর আস্থা ছিল না, ভালভাবে ভেবে বলছ তো ঠাকুর?

সুদামের কণ্ঠস্বর তখন গুনছেঁড়া নৌকার মত উদ্দাম, হ্যাঁ, অনেক ভেবেই বলছি।

টগর বলেছিল, তাহলে চলো—

সুদাম এরপর আর একবার বাজিয়ে নিতে চেয়েছিল, তুমি রাজী আছো তো টগর? আমি একটা আধবুড়ো মানুষ। চালচুলো নেই। হঠাৎ নিয়ে ঘরে তুললে পড়শীরা কি বলবে—

টগর চাবুকের মত হয়ে উঠেছিল, লোকের কথায় কান দিই না আমি। আমি তো সবই খুইয়েছি—

সুদাম আরো পরিষ্কার হতে চেয়েছিল, আমায় শেষ পর্যন্ত তুমি সহ্য করতে পারবে তো। বাউণ্ডুলে মানুষ আমি—

টগর সাদাসাপ্টা উত্তর করেছিল, কেন পারব না। একা একা থাকি। তবু, একটা মানুষ পাশে থাকলে বল ভরসা পাব।

সুদাম বৈরাগী আর দ্বিরুক্তি করেনি। কাঁধে ঝোলা-কাঁথা তুলে নিয়ে বলেছিল, চলো তাহলে—

রেলগাড়ি ছেড়ে দিতে টগর আর একবার অমঙ্গল গেয়েছিল, কাজটা কি ভাল করলে ঠাকুর। সন্নেসী মানুষ। ঘরে মন টিকবে তো?

সুদাম আরেক পশলা হেসেছিল, দেখিই না একবার চেষ্টা

করে। যদি না টেকে তো আবার বেরিয়ে পড়ব। তাতে তো কোন বাধা নেই।

দুপাশের মাঠ পুকুর ক্ষেত গাছগাছালি গেঁয়ো মানুষের কুটির পেছনের দিকে সরে সরে যাচ্ছিল।

টগর বলেছিল, ঠিক আছে—

সে-কথার উত্তরে বৈরাগী গুনগুনিয়ে উঠেছিল, 'ভোলামন, ঠিক করে নে ধরবি গাড়ি কোন্ ইষ্টিশনের—'

দ্রুতপায়ে হাঁটছিল টগর। হঠাৎ একসময় কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জগা বলল, কিরে দাঁড়িয়ে পড়লি যে বড়।

লাশ তখনো বেশ খানিক দূরে।

টগর বলল, তুই যা জগা। আমি আর এগুব না।

জগা কটাক্ষ করল, কিরে, ভয় পেয়ে গেলি নাকি?

জগার অনুমান মিথ্যে নয়। প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়েই টগর এগুচ্ছিল। মৃত্যুটা অস্বাভাবিক। তাই কৌতূহলটা ছিল তেজী। লোকটা কে হতে পারে। রেলকলোনীর কেউ কি। অথবা, অন্য কোন পরিচিত কেউ। এই ঔৎসুক্যবোধের অতিশয্যেই বাসিমুখে টগর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

ঝোঁকের মাথায় কিছুটা এগুবার পর তার ভাবনায় হঠাৎ যেন বাজ পড়ল। তখন লাশটাকে সরেজমিনে দেখার ইচ্ছেটা আর রইল না।

জগা এগিয়ে যেতে রেললাইনের ওপর খানিকক্ষণ শিকড়-বাকর নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল টগর।

সে ভাবতে গিয়ে আঁৎকে উঠল। তাহলে কি গোরাবাবু ওখানে পড়ে আছে! বিচিত্র নয়।

লোকটার আসল নাম টগরের জানা নেই। কতবার শুধিয়েছে। তোমার নামটা কি বলো না বাবু। লোকটা মাথা নেড়েছে।

আমার নাম দিয়ে তোমার দরকারটা কি। এসেছি ফুর্তি করতে। দুদণ্ড থাকব। তারপর চলে যাব। এর মধ্যে আবার আমার ঠিকুজি পরিচয় জেনে তোমার লাভ!

টগর হাল ছাড়েনি। তক্কে তক্কে থেকেছে। কিন্তু, মানুষটাকে কখনই সে কায়দা করতে পারেনি। বেহেড মাতাল হয়ে ভুল বকতে যখন শুরু করেছে—তখনো উত্তর একই থেকেছে।

শেষ পর্যন্ত একদিন রেগে গিয়ে বলেছে টগর, তুমি তো আচ্ছা মানুষ। নামটা বলতে চাওনা কিছুতেই। আসলে তুমি আমাকে ভালবাসো না তাই—

গোরাবাবু টগরের মানভঞ্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, রাগ করলে টগর—

টগরের কপট অভিমান আরো সোচ্চার হয়ে উঠেছে, রাগ করব না তো কি। আমি জানি,—তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না। ভয় পাও। যদি তোমার পরিচিত কাউকে বলে দিই—

গোরাবাবু টগরের চুলের ঝুঁটি ধরে আদর করেছে। বলেছে, ভয় পাব কেন। আমি তোমাকে ভালবাসি টগর। সত্যি কথাটা কি জানো, তোমার কাছে যখন আসি তখন বাইরের পরিচয়টাকে ধুয়েমুছেই আসি।

লোকটার কথায় যে কোন ছল-চাতুরী নেই এটা ধরতে পারে টগর।

তাই, শেষ পর্যন্ত টগর আর এগুতে চায়নি। শুধিয়েছে, তাহলে তোমায় কি বলে ডাকব বাবু। একটা নাম তো চাই—

গোরাবাবু হেসে বলেছে, যে নামে ডাকলে তোমার ভাল লাগে সেই নামেই ডাকবে—

টগর না ভেবেচিন্তেই সেদিন বলে ফেলেছিল, ঠিক আছে, আজ থেকে তোমাকে আমি গোরাবাবু বলেই ডাকব। আপত্তি নেই তো?

সেদিন গোরাবাবু শরীর কাঁপিয়ে হেসেছিল, বাঃ, বেশ নাম।

নামটা যুতসই হয়েছিল। বয়স চল্লিশের মত হলেও লোকটার শরীরে এক ছিটে মেদ জমেনি। ছিপছিপে পাকানো চেহারা। বেশ লম্বা। ফরসা। শুধু চোখের দৃষ্টিই যা একটু অস্বাভাবিক। বর্ষাকালের নদীজলের মত। ঘোলাটে, ছন্নছাড়া।

সুদাম বৈরাগী বিরসবদনে চুপচাপ বসেছিল। একসময় খুপরি থেকে হরেন পয়রা হাঁক পাড়ল, কি হল বৈরাগী ঠাকুর! একেবারে যে সাড়াশব্দ পাচ্ছি না—

সুদাম বৈরাগী হরেনের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তবু দুজনে খুব মিল-মহব্বত। তার কারণ একটাই। দুজনেই সারাদিন ঘরে বসে। মুখোমুখি দাওয়ায়। হরেন দিনমান হাতুড়ি বাটালী নিয়ে ঠুকঠুক করছে। দায়ে না পড়লে ঘর থেকে বেরোয় না। একজোড়া ক্র্যাচ অবশ্য বানিয়ে নিয়েছে। তাতে ভর দিয়ে রেল লাইনের ওপর দিয়ে যখন তখন হাঁটাচলা করা যায় না।

ইলেকট্রিক ট্রেন। পূবালি বাতাসের মত কখন ছুটে এসে পড়ে ঘাড়ের ওপর। ঘর পোড়া গরু তো! তাই বড় একটা বেরোয় না হরেন।

সুদাম বৈরাগীও বলতে গেলে সারাদিন ঘরে। দুজনের সংসার। কিইবা এমন কাজ। সকাল থেকে সন্ধ্যার ভেতর একবার যে কোন সময় বাজারে যাওয়া। আর দুপুরের দিকে রেলগুমটির ওধারের কর্পোরেশনের টিউবওয়েল থেকে দুবালতি খাবার জল নিয়ে আসা। ব্যস। আর কিছু করণীয় নেই বৈরাগীর। সময় কাটতে চায় না তার। দাওয়ায় বসে ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানে আর ঝিমোয়। আর ফাঁকে ফাঁকে হরেন পয়রার সঙ্গে কথার জাবর কাটে। আগে আশপাশের খুপরির দুচারজন করে লোক আসত বৈরাগীর কাছে। কুশলাদি জিজ্ঞেস করত। গল্পসল্প করত। গান শুনতে চাইত। সে পাট চুকে গেছে। এখন

ডেকে কথা বলতে চাইলেও তারা বৈরাগীকে এড়িয়ে যায়। টগরের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবার পর থেকেই।

বৈরাগী উঠোনে নামল। মুরগীটা ফের উত্তরের ঘরে চলে গেছে। বিশ্রি চেঁচাচ্ছে মুরগীটা।

নিম্ মুখে হরেনের প্রশ্নের জবাব দেয় বৈরাগী, কিছুই আর ভাল লাগেনা ছুতোরের পো। একঘেয়ে জীবন। পড়ে আছি নরকে। আগেই ছিলাম ভাল। দিব্যি হাটেমাঠে ঘুরে বেড়াতাম। কোনো পেছুটান ছিল না। কি যে দুর্মতি হল—

বৈরাগীর কথায় হরেনও দার্শনিক হয়ে ওঠে। তর্ক করতে চায়, দুর্মতি বলছ কেন ঠাকুর। সারাজীবন কচুরীপানার মত এখানে সেখানে ভেসে বেড়ানোয় কি সুখ আছে। তারচেয়ে, তবু তো একটা ছাউনির তলায় আছো—

বৈরাগী হাসে মনে মনে। প্রকৃত সুখ জিনিসটা কি। খাওয়া-পরা ঘুম। নিরুদ্বিগ্ন জীবন। এতেই কি জীবনের চরম সুখ, মোক্ষ! সুখের মর্ম বিষয়ী হরেন কি বুঝবে। মস্ত ভুল হয়ে গেছে তার। পঁচিশটা বছর ঘাটে-আঘাটায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। শেষের দিকে নিজেকে মনে হত যেন দম্-দেওয়া পুতুল। যতক্ষণ দম আছে সে চলবে। চলতেই হবে। থেমে পড়ার সাধ্য নেই। এই অবিরাম চলার মধ্যেও একটা একঘেয়েমি ছিল। তাই থেমে পড়বার আগেই স্বেচ্ছায় সে টগরের আশ্রয়ে মাথা গুঁজতে চেষ্টা করেছিল।

এখন সুদাম বৈরাগী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। থেমে পড়ার ফলটা কি। থেমে পড়া মানেই ক্লীবত্ব। শাস্ত্রে আছে, লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু। আশ্রয়ের লোভে সে টগরের সঙ্গ নিয়েছিল।

তবু বৈরাগী নিজের ভেতরের আয়নায় বাইরের মানুষটার মুখ বার বার দেখে। আর প্রশ্ন করে নিজেকেই। কেন এমনটা হল। পাপের ষোলআনা দায়ভাগ কি কেবল তারই। সে তো রিপুর

তাড়নায় জর্জরিত হয়ে টগরের পেছু নেয় নি। কিংবা, কেবল নিজের স্বার্থের কথা ভেবে—মনের ক্লান্তি আর শূন্যতা দূর করার জন্যে টগরকে আঁকড়ে ধরেনি। তার চেয়েও একটা বড় কারণ ছিল এখানে আসার। নিজের অতীতকালের অসুখী জীবনের ছায়াটা যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছিল টগরের মধ্যে। আর সেই জন্যেই তো আগুপিছু না ভেবে এক রাত্তিরের মধ্যে পঁচিশ বছরের বাউণ্ডুলে জীবনটাকে খারিজ করে এখানে এসেছিল। উদ্দেশ্য—অসুখী টগরকে বাঁচানো।

এখন বোঝে বৈরাগী—সেটা কত বড় ভুল। দয়া কিংবা সহানুভূতি দিয়ে টগরের জীবনের অভাবগুলো দূর করা যাবে না। টগর যে মনের দিক থেকে রিক্ত তার আসল কারণটা বৈরাগী প্রথমটায় ধরতে পারেনি। সুদাম বৈরাগী টগরের দুঃখটাকে নিজের মত করে ভেবেছিল। তার ধারণা হয়েছিল—একটা মানুষ কাছে থাকলে হয়ত টগরের দুঃখ তাপ সব দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু, এখানে এসে কয়েকদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল—তার ধারণাটা কত ভুল। টগর গৃহী মেয়েমানুষ। তার দেহে পঁচিশ বছরের দুরন্ত রিপুগুলোর খেলা করে চলছে সমানে। টগর বাসনা কামনা মুক্ত নয়। বরং, সেগুলো চরিতার্থ হচ্ছে না বলেই তার শরীর পোড়াকাঠের মত ধিকি ধিকি জ্বলছে।

আর, বৈরাগী শুধু মনের দিক থেকেই সংসারবিবাগী নয়—দেহের দিক থেকেও গৃহীমানুষের মত রসেবশে নেই। তার প্রধান কারণ তার দেহে এখন ভাঁটার টান। পঁচিশ বছরের দামাল মেয়েটাকে দৈহিক দিক থেকে সুখী করার শক্তি-সামর্থ্য নেই বৈরাগীর। ইচ্ছেও নেই। অনেককাল আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে মানুষের তৈরী করা সংসার থেকে দূরে থেকে থেকে এখন সে বাতাসের মত ফাঁপা। আকারহীন। কোন কিছুতেই তার আসক্তি কখনো প্রকট হয়ে ওঠেনা।

ভাল করতে এসে টগরের খারাপই করল বৈরাগী। একথা মনে হলে সুদাম বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। সে এখানে না এলে টগর আরো কিছুকাল হয়ত শান্ত থাকত। সন্তান শোক আর স্বামীর উপেক্ষা আরো কিছুকাল হয়ত টগরকে সংযত রাখত। কে জানে, হয়ত সেই সংযম ধীরে ধীরে টগরের মনটাকেও হয়ত একদিন বেঁধে ফেলত। সংসারের মালিন্য আর রিপুর তাড়নাকে সে জয় করত একদিন।

হঠাৎ, ওর জীবনের মাঝপথে বৈরাগী এসে পড়ায় যেন গরম ভাতে ঘি পড়ল। এতকাল একলা ছিল টগর। শোকে তাপে জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত। বৈরাগী আসায় ভেতরের রক্তমাংসের মেয়েমানুষটা তার ক্ষুধা তৃষ্ণা সমেত মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। টগরের সেই ক্ষুধা বৈরাগী মিটোবে কোত্থেকে।

মাসকয়েক স্বাভাবিক ছিল টগর। চালের চোরা কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল পুরোদমে। তারপর এল মতিচ্ছন্নতা। কাজকর্ম বন্ধ করে ঘরে বসে রইল।

বৈরাগী বলে, কিহে, সারাদিন যে ঘরেই দেখছি। বেরুবে না?

টগর উত্তর দেয়, না। চালের কারবার আর ভাল লাগছে না—

বৈরাগী, শরীর ভাল আছে তো?

টগর অদ্ভুত চোখে বৈরাগীর দিকে তাকায়। যেন তার শরীর নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা বৈরাগীর সাজে না। মুখে বলে টগর, হ্যাঁ, শরীর ভালই আছে। তবে দৌড়োদৌড়ি আর পোষাচ্ছে না। তাই কদিন ভাবছি—জিরিয়ে নিই।

সময় বসে থাকেনা কারুর জন্যে। অভাবী লোকের কমতি নেই রেলকলোনীতে। চালের চোরাকারবারের দল টগরের জায়গায় নতুন লোক জুটিয়ে নেয়।

ক'দিন পরেই টগরের মতিগতি ধরে ফেলে বৈরাগী। টগরের অবসাদ আসলে নিজেকে মনের দিক থেকে নতুন করে তোলার একটা প্রস্তুতিমাত্র।

বিষয়টা একদিন জলের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৈরাগীর কাছে। সেদিন সন্ধ্যায় একটা লোককে টগর জুটিয়ে আনে ঘরে। উত্তরের ঘরে ঢুকে দুজন গলাগলি ঢলাঢলিতে মত্ত হয়ে ওঠে।

সেদিন রাতে কিছু বলেনি টগরকে বৈরাগী। পরের দিন সকাল হতে রাগে ফেটে পড়ে সুদাম। একটা হেস্তনেস্ত করতে চায় টগরের সঙ্গে।

বলেছে বৈরাগী, কাল রাতে ঘরে এসেছিল—লোকটা কে ?

বৈরাগীর প্রশ্নে ঝাঁঝ ছিল। টগর সেটা ধরতে পেরে সমান তালে যুঝেছিল, সবাইকে কি তুমি চেনো ?

বৈরাগীর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, তাহলে তুমি শেষ পর্যন্ত এই পথে নামলে টগর ?

টগর মুহূর্তে ভিন্নমূর্তি ধারণ করেছিল। বলেছিল চড়া গলায়, হ্যাঁ, তাই—

বৈরাগী ফুঁসে উঠেছিল, চমৎকার! তোমার পেটে এত ছিল টগর ?

টগর বেপরোয়া উত্তর করেছিল, অতশত ভেবে আমি কিছু করি না বৈরাগী। যখন যেটা ভাল লাগে সেটাকেই আমি ধরি।

বৈরাগী বোঝাতে চেয়েছিল টগরকে, চালের কারবারে অসুবিধেটা কি হচ্ছিল ? বেশ তো চলে যাচ্ছিল দুটো পেট। হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে—

টগরের মুখ তখন ফোয়ারা। বলেছিল, চালের কারবারের সুবিধে-অসুবিধের তুমি কি বুঝবে ঠাকুর। তুমি তো অষ্টপ্রহর ঘরে বসে আছ ভোলানাথ হয়ে। সারাদিন, জল নেই ঝড় নেই চালের বস্তা কোলে কাঁখে নিয়ে ছোটাছুটি। এই পুলিশে তাড়া করল। এই ধরল রেলবাবুরা। প্রাণটা হাতে নিয়ে লাফিয়ে পড়ো ট্রেন থেকে। বস্তা খোওয়া গেলে মহাজন অশ্লীল খিস্তি মারে। পয়সা

তো দেয়ই না। তারওপর মা বাপ জাতধম্ম তুলে গালাগালি দেয়। কোন ইজ্জৎ আছে চালের কারবারে ?

বৈরাগী সুযোগ পেয়ে চেপে ধরেছিল, চমৎকার বললে টগর !! ঘরে মানুষ ধরে এনে ফুর্তি করলে বুঝি ইজ্জৎ বাড়ে !

টগরের জিভ লকলকিয়ে উঠেছিল, ইজ্জৎ না থাকুক। দশ-জনের কাছে মাথা হেঁট তো করতে হয় না—

বৈরাগী বিষণ্ণ হয়ে সে কথার উত্তরে বলেছিল, তাই বলে শরীরটাকে অপবিত্র করে—

টগর কথাটা কেড়ে নেয়, ওসব বড় বড় কথার ধার ধারি না ঠাকুর। যা ভাল লাগে তাই করি—

বৈরাগী সহজে ছাড়তে চায়নি, ভাল লাগে বলে পাপ-অনাচারে ডুবে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে টগর। সে—কথায় টগর ভাঙে না। মচকায়ও না। বলেছিল, পাপপুণ্যের পরোয়া করি না ঠাকুর। ওসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও —

বৈরাগী গম্ভীর গলায় বলেছিল, এতটা নেমে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না টগর—

দুর্বল জায়গায় আঘাত লাগতে টগর সাপের মত ফণা তুলে-ছিল, পাপ মনে করলেই পাপ। না করলে নয়। মনটা আমার অনেককাল হল নষ্ট হয়ে গেছে ঠাকুর। থাকার মধ্যে ছিল শরীরটা। খামাকা সেটাকে উপোসী রাখি কেন—

বৈরাগী টগরের কথায় কাদামাটি হয়ে গিয়েছিল। বুকের ভেতরটা নড়ে গিয়েছিল। তবু সুদাম হারতে চায়নি। বলেছিল, আমাকে আগেভাগে একবার বললে তো পারতে। না হয় তোমার জন্যে ফের একবার ধরাচূড়া পরতাম। গোপীযন্ত্রটা হাতে নিয়ে বাড়িবাড়ি ঘুরতাম। নামগান করতাম। মাধুকরীতে যা আসত তাতে আমাদের দুজনের পেট চলে যেত কোন রকমে—

এরপর টগর এককথায় বৈরাগীকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, ভিক্ষের চাল আমার গলা দিয়ে নামবে না ঠাকুর।

ফের দাওয়ায় উঠে এল সুদাম বৈরাগী। হুঁকোর মুখ থেকে কলকে খসিয়ে উপুড় করল। তামাক ঝাড়ল। ঠিকরেটা পরিষ্কার করল

হরেনের ছেলেটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। বেজায় ছিঁচকাদুনে হয়েছে ছেলেটা। কেবল খাই খাই বায়না।

তামাক সেজে টিকে ধরাতে সুদাম বৈরাগীর চোখে জ্বালা ধরল। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি বৈরাগীর। উত্তরের ঘরে সন্ধ্যা থেকেই এক বাবু এসে বসেছিল। ছিল অনেক রাত অব্দি। জোর হল্লা গুল্লা চলেছিল। কাল বড় বাড়াবাড়ি করেছে টগর। প্রথম রাতে যা হ'ক একটু ঘুম হয় বৈরাগীর। কাল ওদের চেঁচামেচিতে তা-ও হয়নি।

বৈরাগী ভাল করেই জানে—এখন টগরের কাছে তার মূল্য কানাকড়ি নেই। তবু সে পড়ে আছে কেন। অনাদর আর উপেক্ষা সহ্য করে। সেটা,—ভেবে দেখেছে বৈরাগী, হয়ত সে মনে মনে টগরকে ভালবাসে বলেই।

নইলে, বৈরাগী কি বোঝে না—টগর তাকে ব্যবহার করছে বিশ্রিভাবে। শুধু দুবেলা দুমুটো অন্নের বিনিময়ে !

সে চলে গেলে টগর বিপদে পড়বে। হয়ত সেই কারণেই টগর তাকে পুষছে। রেলকলোনীর জীবনে আর কোথাও যে অনাচার ব্যভিচার নেই তা নয়। সাতহাটের লোক জড়ো হয়েছে এখানে। ধান্ধা সকলের একটাই। যেন তেন প্রকারে বেঁচে বর্তে থাকতে হবে। কিন্তু, সৎভাবে বাঁচার সামর্থ্য বা যোগ্যতা আছে ক'জনের। তাই, এখানকার মানুষের ন্যায়নীতি ধর্মাধর্মের বালাই নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না।

তবে,—সবকিছুই হয় আড়ালে-আবডালে। ঠারে-ঠোরে। খোলাখুলি যাচ্ছেতাই করলে বাধা না আসুক বিপদ আসতে পারে। সেদিক থেকে সুদাম বৈরাগী টগরের রাতের পাপব্যবসার একটা চমৎকার আড়াল। তাকে টগরের সামাজিক পরিচয়ের

একটা নির্ভরযোগ্য সাইনবোর্ড-ও বলা যেতে পারে। ভেতরে যা-ই হোক না কেন।

প্রত্যেক রাতে খুপরিতে লম্পট লোকেদের আনাগোনা। গান হাসি-মদ্যপান। বেলেল্লাপানায় মত্ত হয়ে ওঠা—

এসব যে কারুর অজানা তা নয়। তবে রেলকলোনী তো আর বেশ্যাপাড়া নয়। সবরকমের নষ্টামি চলছে এখানে। চলবেও। তবে সেটা রেখে-ঢেকে। সামাজিকতার একটা তকমা থাকা চাই। অনেকটা, বলা যেতে পারে, ঘোমটার নিচে খেমটা নাচ আর কি। সব কিছু চলুক। তবে তা পর্দার আড়ালে। সুদাম বৈরাগী হল এই পর্দা। দিনের আলোয় পর্দা সরিয়ে টগর সকলের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারছে। আবার রাত হলে নিষিদ্ধ মেয়েমানুষ হয়ে যাচ্ছে। সবমিলিয়ে সাপও মরছে না, লাঠিও ভাঙছে না।

এক একদিন টগর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। অনেক কষ্টে পাশের ঘরে অন্ধকারে নিজেকে সামাল দেয় বৈরাগী। রাগে জ্বলে ওঠে কখনো। কখনো বা আত্মগ্লানিতে সর্বশরীর রি-রি করে ওঠে। তখন, নিজেকেই সে নিজে শাপান্ত করে।

এক এক সময় বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চায় বৈরাগী। একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চায়। ভাবে: না, আর নয়। অনেক করেছি। রাতটুকু শেষ হোক। পালাতে হবে এই নরককুণ্ড থেকে।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত পারে না বৈরাগী। টগরের প্রতি মমতা জেগে ওঠে কখন। নইলে, রাতে বাবুরা চলে যেতে দুচারদিন সে টগরের ঘরে ঢুকেছিল। একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য। কিন্তু, ভেতরে ঢুকে তার রাগ ধীরে ধীরে জল হয়ে যায়। টগর বেহুঁস। চাটাইয়ের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাঁৎরাচ্ছে। থেকে থেকে চিৎকার করছে। প্রসবব্যাথার সময় মায়েরা যেমন চেঁচায়।

সুদাম বৈরাগী কাছে এসে হাটু গেড়ে বসে। উত্তেজিত গলায় ডাকে, টগর। ও টগর, শুনছ।

টগর তখন উদলাবাদলা হয়ে পড়ে আছে। টগর এমন ভাবে ছটফটায়, দেখে মনে হয় বৈরাগীর, যেন ওর সারা অঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। কেউ যেন ওর শরীরটাকে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। সুদাম বৈরাগীর ডাকে হেঁচকি তুলে বলে টগর দুর্বোধ্য গলায়, উঁ—

বৈরাগী টগরকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, শুনছ টগর, একটা কথা বলব তোমাকে—

হ্যারিকেনের কাচে কালি পড়ে অদ্ভুত আঁধার জমে ওঠে চারদিকে। টগর শোলমাছের মত ঘাঁই মেরে পাশ ফিরে বৈরাগীকে ধরে একহাতে। বলে, কে, কে?

ঘৃণায় বৈরাগী মুখ ফেরায়। টগরের মুখ থেকে মদের গন্ধ উথলে ওঠে। পাপের শরীর টগরের। নষ্ট পচা শরীর।

দাঁতে দাঁত চেপে কর্কশ গলায় বলে বৈরাগী, তোমাকে শেষ কথাটা বলতে এসেছি টগর—

টগর হিক্কা তোলে। অন্ধকারে ওর শরীর সরীসৃপের মত পাক খেয়ে ওঠে। জড়ানো গলায় হেসে বলতে চায় টগর, শেষকথা! সে কি গো ঠাকুর। কথা যে আমাদের শুরুই হল না—

একঝটকায় টগরের হাত সরিয়ে দিয়ে বলে বৈরাগী, ভাবছি কাল সকালেই চলে যাব এখান থেকে। আর ভাল লাগছে না—

টগর কুলকুল করে হাসে। বলে, কাকে ভাল লাগছে না গো ঠাকুর?

বৈরাগী সাফ জবাব দেয়, তোমাকে। তুমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছ টগর।

আবছায়ায় টগরের ভাবান্তর চট করে ধরা যায় না। টগর বলে, সত্যি বলছ ঠাকুর?

বৈরাগীর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয়ে আসে, মিথ্যে কেন বলব। রোজ রাতে ঘরে লোক ডেকে আনছ। মদ গিলছ। ফুর্তি করছ। তবুও কি বলতে চাও তুমি সৎ আছো?

এরপর টগরের আসল মূর্তিটা ধরা পড়ে। সে পাগলিনীর মত এগিয়ে দুহাত বাড়িয়ে বৈরাগীর গলা জড়িয়ে ধরে। মাঝখানের অন্ধকারের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে টগর, আমাকে ফেলে তুমি চলে যেতে পারবে, ঠিক বলছ ঠাকুর—

টগরের ক্লেদাক্ত দেহ থেকে মুক্তি পেতে চায় বৈরাগী। বলে অকরুণ গলায়, কেন পারব না। পঁচিশটা বছর সংসারের বাইরে ছিলাম না!

হ্যারিকেনের কাচে আরো কালি জমে ওঠে।

বৈরাগী টের পায়—তার কথা শেষ হতে না হতে টগরের শরীরে বৃষ্টির ধারার মত কান্নার বেগ ফেটে পড়ে।

আর্তনাদের ভঙ্গিতে টগর চেঁচায়, এই আমার কপালে ছিল ঠাকুর!—তারপর আরো কাঁদে টগর।

বৈরাগী আর স্থির থাকতে পারে না। নিজের বুকের খাঁচায় টগরের মাথাটা টেনে নিয়ে বলে, এইখানেই তোমার জিৎ টগর। তুমি কাঁদলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না।

হ্যারিকেনের শিখা এক সময় দপ করে নিভে যায়। অন্ধকারে ডুবে যায় চরাচর। শুধু জেগে থাকে দুটি প্রাণ।

বৈরাগীর পাষাণ বুক মমতায় টলটল করে ওঠে। সে আবেগ জড়ানো গলায় ডাকে, টগর, ও টগর—

টগর তখন বৈরাগীর কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বৈরাগীর ঘুম আসেনা। ঘুরে ফিরে তরঙ্গর কথা মনে পড়ে যায়। রাতভর টগরকে কোলে নিয়ে বসে থাকে। বৈরাগী ঈশ্বর মানে। ভবিতব্য মানে। প্রাক্তনে বিশ্বাস করে। ভাবে: এই ছিল তার কপালে। টগরের গেরো মস্ত গেরো। ওকে ছেড়ে সে পালাবে কোথায়।

এক সময় সুদাম বৈরাগী গুন গুনিয়ে ওঠে:

প্রাণ কাঁদে যার তরে তারে, কোথা পাব গো দেখা।

কোথায় থাকে ধাম জানিনা, ও তার নাম শুনেছি প্রেমমাখা ॥
কত ডাকি উত্তর পাইনা, কত কাঁদি দেখা দেয় না।
পাছু পাছু বেড়াই ঘুরে, স্বভাবটি তার লুকিয়ে থাকা ॥

টগর ফিরে আসছিল ঘরের দিকে। চিন্তা দুর্ভাবনায় ওর চলার গতি শ্লথ হয়ে পড়েছিল। ওর মাথার ভেতর হাজার ভিমরুল চক্কর খেয়ে হুল ফোটাচ্ছিল যেন ক্রমাগত। লাশটা সত্যি যদি গোরাবাবুর হয়। হওয়া অসম্ভব নয়।

কাল রাতে টগরের ঘরে গোরাবাবু এসেছিল। গোরাবাবু যেদিন আসে সেদিন আর কাউকে টগর ঘরের ধারে কাছে ঘেঁসতে দেয় না। কাল ছিল রবিবার। ছুটির দিন। গোরাবাবু ছিল অনেক রাত পর্যন্ত। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বিলিতি মালের বোতল। এক নম্বর হুইস্কি। আর কষামাংস রুটি।

প্রথম দিন থেকেই বিলিতি জিনিস নিয়ে আসছে গোরাবাবু। টগর আপত্তি করেছিল, খামাকা এত পয়সা নষ্ট করে বিলিতিমাল আনো কেন বাবু—

গোরাবাবু বিজ্ঞের চালে উত্তর করেছিল, রাতদিন কেবল দিশি মাল খাও, পেট যে তোমার পচে যাবে টগর—

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ এই গোরাবাবু। আগে কোনদিন জিভে এক ফোঁটা মদ ছোঁয়ায় নি। যারা মদ খায় তাদের সম্বন্ধে ওর ঘেন্না ছিল। কিন্তু, টগরের জন্য নিয়মিত মদ আনত।

টগর পীড়াপীড়ি করলে বলত গোরাবাবু, অভ্যেস নেই টগর। কখনো কোন নেশা করিনি—

টগর চোখ মটকে বলত, তাই নাকি! নেশাছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে? মেয়েমানুষে নেশা নেই তোমার! নইলে আমার কাছে আসছ কেন?

সে-কথায় লোকটা অন্য মানুষ হয়ে যেত। মলিন হেসে নির্বীষ গলায় বলত, আচ্ছা টগর, আমাকে দেখে তোমার কি মনে

হয় টগর? আমি বুঝি খুব মেয়েমানুষ নিয়ে ঢলাঢলি করি, তাই না?

টগর হাসত, আলবৎ। ধর্ম করতে কেউ নষ্ট মেয়েমানুষের কাছে আসে না!

গোরাবাবু উত্তরে হাসত। লোকটাকে চিনতে সময় লেগেছিল টগরের।

প্রথম দিকে ঘরে এসে নিজের হাতে ছিপি খুলে বোতল থেকে মদ ঢেলে টগরের হাতে দিত গোরাবাবু। টগর রেগে যেত। মদ গিলবার ব্যাপারে টগর বেপরোয়া। লোকটা সময় নিয়ে মেপেঝুপে টগরের দিকে গেলাস এগিয়ে দিত।

এক একদিন অধৈর্য হয়ে টগর গোরাবাবুর হাত থেকে বোতল ছিনিয়ে নিতে চাইত। গোরাবাবু বাধা দিত। বলত, উহুঁ, আগে রুটিমাংস খেয়ে নাও। তারপর বোতল খুলব—

টগর রেগে যেত। মদ গিলবার ব্যাপারে এতটা পারবশ্যতা টগরের সহ্য হত না। বলত, বিকেল থেকে গলাটা শুকিয়ে আছে। আগে খানিকটা গলায় ঢেলে নিই, তারপর—

টগর ঘাড় গুঁজে অগত্যা মাংসরুটি চিবোত।

গোরাবাবু হাসত, রাগ করলে টগর! এত তাড়াহুড়োর কি আছে। আমি তো অনেকক্ষণ থাকব। সাততাড়াতাড়ি বোতলটা ফুরিয়ে গেলে তারপর কি আর আমাকে তোমার ভাল লাগবে টগর?

কথাটা মিথ্যে নয়। লোকটার চেয়ে বিলিতি মালের প্রতিই টগরের আকর্ষণ ছিল বেশি।

টগর বুঝত—গোরাবাবু আর পাঁচজন রাত-পুরুষের ধারার মানুষ নয়। শুধুই ফুর্তি করতে আসে না ও। আসে শান্তি পেতে। টগরের সান্নিধ্য ভাল লাগে ওর।

সেই জন্যেই একদিন টগরের পীড়াপীড়িতে মদ ধরেছিল লোকটা।

কালকেও যথারীতি সন্ধ্যাসন্ধি এসেছিল গোরাবাবু। আগের রবিবার বলে গিয়েছিল। লোকটার কথার দাম আছে। টগর জানত—হাজার বিপদআপদ হোক মানুষটা ঠিকই আসবে।

গোরাবাবু যেদিন আসে সেদিন সকাল থেকেই নিজেকে তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে টগর।

টগর মানুষটার অনেক কিছুই জেনে গেছে। কোনটা করলে গোরাবাবু খুশি হবে আর কোনটা করলে হবে না—এসবই এখন টগরের নখদর্পণে। ফিটফাট না থাকলে গোরাবাবু বিরক্ত হয়। জোর বকুনি খেতে হয় টগরকে। বলে: একটু সেজেগুজে থাকতে পার না। তুমি তো বাজারের গন্ধ মেয়েমানুষ নও।

গোরাবাবু আসার পর থেকেই টগর যা একটু আধটু শরীরের চর্চা করে। ভাল করে স্নান করে। গায়ে গন্ধ সাবান মাখে। চুলে ফুলেল তেল দেয়। কপালে টিপ পরে। চোখে কাজল আঁকে। কাচা শাড়ি পরে। আগে এসব ছিলনা। নোংরা, অগোছাল থাকত টগর। নিজের ভরন্ত টসটসে শরীরটার ওপর তার সবচেয়ে বেশি রাগ ছিল। টগর ভাবত: ভগবান এর চেয়ে তাকে যদি রূপসৌন্দর্যহীন করতেন তাহলে ভাল হত। কেউ তার শরীরের দিকে নজর দিত না। রেলকলোনীর আর দশজন কুরূপা বউঝি যেমন দিন গুজরান করছে—সেও তেমনি চলত।

অনেক চেষ্টা টগর করেছিল। নিজেকে ঠিক রাখার জন্য। ভাতার ঘর ছাড়লে সে প্রথম আশপাশের বাবুদের বাড়ি ঝি-র কাজ করেছিল।

তখন কোলের বাচ্চাটাও তার ভরন্ত গতরকে ইতর পুরুষমানুষের লোলুপ দৃষ্টির আড়াল করতে পারেনি। বাবুরা একাচোরা পেলেই গায়ে হাত দিয়েছে। কুপ্রস্তাব করেছে।

চালের ব্যবসাতে ঢুকেও টগরের একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দলের লোকেরা হাত ধরে টেনেছে। পুলিশের তাড়া খেয়ে মাল

ফেলে পালিয়ে এলে মহাজন চাল না পেয়ে তার শরীর চটকে লোকসান পূরণ করেছে।

টগর তাই বুঝে গিয়েছিল—তার টসটসে রক্তমাংসের শরীরটাই তার সবচেয়ে বড় শত্তুর। তাই, ঘরে যখন সে মানুষ ঢোকাতে শুরু করল—তখন থেকে সব আক্রোশ তার পড়েছিল নিজের গতরের ওপর। তাই শরীরটাকে যত তাড়াতাড়ি নষ্ট করে ফেলা যায় সেই চেষ্টাতে টগর মরীয়া হয়ে উঠেছিল। দেদার দিশি মদ গিলতে শুরু করেছিল। শরীরের দিকে কোন নজরই সে দেয়নি।

গোরাবাবু এসে টগরের হাল হকিকত পাল্টাতে শুরু করল। বলতে গেলে এক রকম জোর জুলুম করেই। গোরাবাবু বলেছিল, এত রূপ যৌবন তোমার টগর। একে হেলায় নষ্ট করছ কেন?

টগর উত্তরে বলেছিল, এই শরীরটাই তো আমার সবচেয়ে শত্তুর গোরাবাবু। এর চেয়ে যদি কুরূপা হতুম তো ভাল হত। নিজেকে নিয়ে এত ভাবতে হত না। নরকেও নামতে হত না।

গোরাবাবু মাথা নেড়েছিল, উঁহু। আমি যখন এসে পড়েছি—, এসব চলবে না টগর। সেজে গুঁজে থাকতে হবে। সুন্দর না দেখালে তোমার কাছে আসব কেন টগর।

গোরাবাবু শুরু থেকেই টগরকে সাজিয়ে তুলতে তৎপর হয়েছিল। ফুলেল তেল, সাবান, ব্লাউজ-সায়া-কাচুলি, নিত্য নতুন শাড়ি নিয়ে হাজির হতে শুরু করল।

কাল গোরাবাবু খোশমেজাজে ছিল। প্যাণ্টের দু' পকেট ভর্তি মুঠো মুঠো টাকা ছিল। তার থেকে এক খাবলা তুলে টগরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল গোরাবাবু, নাও, টাকাক'টা তুলে রাখো। আরো চাই?

গোরাবাবুর ভাল আয়। বালিগঞ্জ ষ্টেশনের উত্তরে রেললাইনের ধারে সিমেণ্ট-চূণ-সুরকি বালির আড়ত আছে ওর। টগর

দশটাকার নোট ক'খানা গুছিয়ে কোলের কাছে জড়ো করে বলেছিল, কি ব্যাপার, আজ যে দেখছি বাবুর মেজাজ খুব দড় ?

টগর লক্ষ্য করেছিল—গোরাবাবুর চোখে বিষণ্ণ হাল্কা ছায়া ভাসছে।

গোরাবাবু বেপরোয়া গলায় বলেছিল, আজকের রাতটা কিন্তু টগর আমি এখানেই থাকব—

টগরের সন্দেহটা আরো ঘন হয়েছিল। সে গোরাবাবুর ভেতরের কথাগুলো টেনে বার করবার জন্যে বলেছিল. তা না হয় থাকলে'। কিন্তু. বাড়িতে বউ আছে না। অসুস্থ মানুষ। চিন্তা করবে যে !

গোরাবাবু কাল দুটো বিলিতি মদের বোতল এনেছিল। দাঁত দিয়ে একটা বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে বলেছিল, গুলি মারো বউকে। সারাটা জীবন তো ওর কাছেই কাটালাম। একটা দিন না হয় তোমার কাছেই থাকি—, তাড়াহুড়ো করে কথাগুলো শেষ করেই অনেকটা কাচা মদ ঢকঢকিয়ে গলায় চালান করে দিয়েছিল গোরাবাবু।

তাজ্জব ব্যাপার ! যে গোরাবাবু কিছুদিন আগেও মদ স্পর্শ করত না, পরে টগরের অনুরোধে অনেক নিয়ম মেনে একটু আধটু খেত—সেই মানুষটাকে উদ্দণ্ড হতে দেখে টগরের বিস্ময়ের শেষ ছিল না।

টগর চোখ বড় করেছিল। উহুঁ, গতিক ভাল বুঝছি না। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। কি হয়েছে—বলো না।

কাচা মদ খেয়ে বুক জ্বলছিল গোরাবাবুর। সে মুখ বিকৃত করে উত্তর করেছিল, কি আবার ঘটবে। এক আধ দিন আমার একটু ফুর্তি করতে ইচ্ছে করে না ?

টগর জিভ টেনে শব্দ করেছিল, আমি কি সে কথা বলছি ! আগে তো তোমাকে কখনো এরকমটা করতে দেখিনি। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম—

গোরাবাবু ফের খানিকটা মদ গিলতে ওর মেজাজ নয়-ছয় হয়ে গিয়েছিল। শুধু যে কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল তা নয়—হাত পা শরীরও নিজের কর্তৃত্বের বাইরে চলে যাচ্ছিল। বড় একটা হিক্কা তুলে জড়ানো গলায় বলেছিল গোরাবাবু, তুমি তো খুব মজার কথা বললে টগর। কোন দিন কাচামদ খাইনি বলে যে আজকেও খাব না—এমনকি কোন কথা আছে?

টগর বুঝেছিল—গোরাবাবুকে বেশি ঘাঁটানো ঠিক হবে না। সে তাই থেমে গিয়ে রুটির সঙ্গে মাংসের কুচি মাখিয়ে দিয়ে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে! খাওনা যত খুশি। আমি কি বারণ করেছি।

গোরাবাবু নাছোড়বান্দা। বলেছিল, বারণ করলেই বা শুনছে কে। আজ দুটো বোতল একলাই শেষ করব। আর তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত সামনে বসে সব দেখবে, বুঝলে?

গোরাবাবু ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেও টগর ঘাবড়ায়নি। কয়েকমাসের পরিচয়ে লোকটার স্বভাবের অনেকটাই টগর ধরে ফেলেছিল। গোরাবাবু আর পাঁচজন নাগরের মত ইতর নয়। বরং, ওর ভেতরের মানুষটা খুবই নরম। সে জায়গায় অল্প নাড়া দিলেই বোঝা যায় মানুষটা কত ভাল।

গোরাবাবু সমানে প্রলাপ বকে যাচ্ছিল, একটু নাচবে টগর। বেশ কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে—

বলতে বলতে গোরাবাবুর চোখ বুজে আসছিল।

টগর তীক্ষ্ণ গলায় উত্তর করেছিল, না। আজ আমার শরীর ভাল নেই।—আসলে টগর লোকটাকে উসকে দিয়ে একেবারে বেচাল করে ফেলতে চাইছিল না।

গোরাবাবু হুমড়ি খেয়ে টগরের গায়ে পড়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ঠিক আছে! নাচতে না পারো একটা গান ধরো। বেশ মজাদার গান—

টগর এরপর আর গোরাবাবুর অবাধ্য হয়নি। অন্য কেউ

হলে গাইত না সে। কিন্তু, গোরাবাবু এর আগে কখনো তার ওপর জুলুম করেনি বলেই গান ধরেছিল টগর।

টগর প্রথম ধরেছিল একটা দেহতত্ত্বের গান। সুদাম বৈরাগীর কাছ থেকে শেখা। 'দিলদরিয়ার মাঝেতে উঠেছে আজব কারখানা। ডুবলে পরে রত্ন মিলে নইলে রত্ন মিলবে না—।'

বিশ্রি চিৎকার করে গোরাবাবু টগরকে থামিয়ে দিয়েছিল, ধ্যেৎ মাগী! এসব জ্ঞানের গান নয়, বেশ একটা রসের গান ধর্—

গোরাবাবুর বেষ্টনীর মধ্যে টগরের পুরুষ্টু শরীরটা খলবলিয়ে উঠেছিল। টগর বলেছিল, তাই বলো! আজ মনে হচ্ছে নাগরের তাগদ্ উথলেছে। ঠিক আছে, শোনো তাহলে—

আঁখি ঢুলু ঢুলু করে দেখো নাগর পড়েছে ঢলে,
রাগের বালিশ মাথায় লয়ে, তোর সোহাগী আছে ঘুমায়ে।
এখন কি জন্য এখানে এলে, তোমায় দেখে অঙ্গ জ্বলে,
যেমন তোমার ভালবাসা, ব্যাধের ঘরে হরিণ পোষা—

প্রথম বোতলটা শেষ করে দুহাতে টগরকে ধরে তার শরীর চটকাতে চটকাতে একসময় বিরক্তির সঙ্গে বলেছিল গোরাবাবু, কি সব বেঁধেছ। খুলে ফ্যালো না—

টগর নিঃশব্দে গোরাবাবুর নির্দেশ পালন করেছিল। আর কেউ হলে স্বমূর্তি ধারণ করত সে। বলতঃ দাঁড়াও আগে, আলোটা নিভিয়ে দিই। পাশের ঘরে বৈরাগী আছে—

শাড়ি ব্লাউজ খুলে নিপুণতার সঙ্গে কাচুলির হুড়কো খুলে অধীর মানুষটাকে বুকে টেনে নিয়েছিল টগর।

টগরের সারা শরীর নির্দয়ভাবে আঁচড়াতে আঁচড়াতে গোরাবাবু প্রশ্ন করেছিল। অদ্ভুত প্রশ্ন: তুমি পেটে কখনও বাচ্চা ধরেছিলে টগর?

টগর মাথা কাৎ করে গোরাবাবুর বুকের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল, হুঁ।

গোরাবাবু শুধিয়েছিল; ছেলে না মেয়ে?

টগরের সেই মুহূর্তে এজাতীয় প্রশ্ন ভাল না লাগবারই কথা। সে উষ্ণ গলায় বলেছিল, তা জেনে কি হবে। যে কাজে এসেছ সেই কাজ সারো তো—

গোরাবাবু তাকে আদর করতে করতে বলেছিল. আহা, বলোই না—

টগরের কণ্ঠস্বরে অনিচ্ছা উপচে পড়েছিল, একটা ছেলে হয়েছিল—

ঘাম দিয়ে জ্বর নামবার মত গোরাবাবুর শরীর থেকে গরম নেমে যাচ্ছিল। সে ফের জিজ্ঞেস করেছিল, ছেলে! কোথায় সেই ছেলে?

টগর সবটুকু দম ছেড়ে দিয়ে বলেছিল. নেই। কবে মারা গেছে—

সে-কথায় গোরাবাবু কেমন নেতিয়ে পড়েছিল। তার দুহাতের বাঁধন আলগা হয়ে গিয়েছিল। উদাস গলায় বলেছিল. ভালই হয়েছে টগর। বেঁচে থাকলে আরো কত কষ্ট দিত তোমাকে—

টগর উঠে বসেছিল। তার অনুমান ডাঙা পেয়ে গিয়েছিল গোরাবাবুর বিষাদমলিন কথায়। সে গোরাবাবুর কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, ব্যাপার কি বলো তো গোরাবাবু। আজ তোমাকে দেখছি একেবারে অন্যমানুষ। এই তেতে উঠছ। এই নিভে যাচ্ছ। বাড়ির খবর সব ভালো তো? বউ কেমন আছে?

গোরাবাবু বিচলিত বোধ করেছিল টগরের প্রশ্নে, এখানে তোমার কাছে এসেছি টগর মজা লুটতে। এর ভেতর আবার বাড়ির কথা কেন তুলছ—

টগর গোরাবাবুর বেচাল হবার আসল সূত্রটা ধরতে পেরে বলেছিল, আহা, বলোই না। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। নইলে তুমি তো এরকম পাগলামি করার মত মানুষ নও গোরাবাবু—

গোরাবাবু আরেকটা বোতল খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বলেছিল একসময়, ওসব কথা যেতে দাও টগর। আর একটা গান ধরো তো—

গোরাবাবুর সংসারের নাড়ি নক্ষত্রের কথা সব জানে টগর। টগরের কাছে গোরাবাবু কিছুই লুকোছাপা রাখে না। সব বলে। বছর দেড়েকের ওপর হল গোরাবাবুর বউ শয্যাগত। দুর্বল। রক্তশূন্য পেটে অসহ্য যন্ত্রণা।

টগর জিজ্ঞেস করল, বউকে নিয়ে হাসপাতালে যাবার কথা ছিল না। গিয়েছিলে?

গোরাবাবু কাঁপা কাঁপা হাতে পাটাতন থেকে কাচের গেলাসটা তুলে নিয়ে বলেছিল, গিয়েছিল। আজই সকালের দিকে।

টগর গোরাবাবুর কপালে নেমে আসা চুলের ঝুপাসি দুদিকে সরিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, ডাক্তারবাবু কি বলল?

গোরাবাবু একটা হিক্কা চাপতে চাপতে উত্তর করেছিল, বলবে আবার কি। অবস্থা খুবই খারাপ। এ্যাদ্দিন যা চিকিৎসা হয়েছে তার আগাগোড়াই ভুল—

টগরের ঢিলেঢালা শরীর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠেছিল, তার মানে?

গোরাবাবুর দম ফুরিয়ে আসছিল যেন, এক্সরে রিপোর্ট দেখে হাসপাতালের বড় ডাক্তার বলল তলপেটে ঘা হয়েছে—

টগর স্বস্তি বোধ করেছিল সে কথায়, তাই বলো। পেটে ঘা। যা ঘাবড়ে দিয়েছিলে। আজকাল তো অনেকেই পেটের অসুখে ভুগছে। ভাল ওষুধ পড়লে ঘা শুকুতে কতক্ষণ—

গোরাবাবুর হাসি আর্তনাদের মত হয়ে উঠেছিল, ভুল টগর। এ ঘা শুকুবার নয়—। ক্যান্সার হয়েছে। অনেক দিন আগেই হয়েছিল। ঠিকমত চিকিৎসা না হওয়ায় বেড়ে গেছে। এখন আর সারবার কোন আশা নেই। যে কটা দিন আর বাঁচবে জ্বালাযন্ত্রণায় কষ্ট পাবে—

'ক্যান্সার' রোগের নাম অপরিচিত নয় টগরের কাছে। মারাত্মক ঘা। যখন টগর ঝি-গিরি করত তখন একবাবুর হয়ে-

ছিল। আলো দিয়ে কয়েকবার শরীরের নানান জায়গা পুড়িয়ে দিয়েছিল। কী ভীষণ কষ্টে মারা গিয়েছিল সেই বাবু।

টগর জোর করে গোরাবাবুর হাত থেকে মদের বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে বলেছিল, আর খেতে হবে না। এবার বকবকানি থামাও তো। আমি গান ধরছি—

গোরাবাবু হাসতে চেয়েছিল, তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছ টগর?

টগরের বলার মত কিছু ছিল না। শুধু অসহায় মানুষটার জন্য তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছিল।

কান্নাভেজা গলায় স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে গোরাবাবু আক্ষেপ করেছিল, কোনদিন কারুর অনিষ্ট চিন্তা করিনি। অন্যায় করিনি কারুর সঙ্গে। তবু, আমার এমনটা কেন হল টগর! একসময় কত কষ্ট করেছি। যখন সুখের মুখ দেখতে শুরু করলাম তখন আমার ঘর ভাঙল—। আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিয়েছিল মানুষটা। টগর সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না।

তারপর একসময় বকে বকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

রাত যখন সাড়ে দশটার মত, শেষ ডাউনট্রেন রেলকলোনীর হাড়পাঁজরা কাঁপিয়ে চলে গেল, তখন কানে জল ঢুকেছিল টগরের। গোরাবাবু তখন পাটাতনে উবু হয়ে পড়ে বিরবির করেই চলেছে।

টগর গোরাবাবুকে ঠেলে তুলে বলেছিল, অনেকরাত হয়ে গেল যে! বাড়ি যাবে না।

গোরাবাবু বলেছিল, বাড়ি? এইতো আমার বাড়ি। আজ আমি এখানেই থাকব টগর।

টগর ইষৎ বিরক্ত হয়ে বলেছিল, বারে, ঘরে অসুস্থ বউটা একলা পরে কাৎরাচ্ছে না!

গোরাবাবু হাত নাড়িয়ে আঙুলে রহস্যময় মুদ্রা তুলেছিল, কার কথা বলছ? সাবিত্রীর? ওকে তো হাসপাতালে ভর্তি

করে দিয়ে এসেছি। বাড়িতে নিয়ে আসিনি তো। চোখের সামনে জ্বালাযন্ত্রনায় চিৎকার করে মরবে—এ দেখা যায় না—

টগর ভেবে বলেছিল, বারে, বউ না থাক্, ছেলেটাতো ঘরে আছে।

গোরাবাবু পাঁজরা কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল, চমৎকার! মদ খেলাম আমি। আর তুমি ভুল বকতে শুরু করলে টগর। ছেলে! কার ছেলে? আমার ছেলের কথা বলছ? তুমি জানো না—সে কদ্দিন হয়ে গেল বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। বেঁচে আ. কি না কে জানে—

গোরাবাবুর দুর্ভাগ্যের জন্য টগরের যথেষ্ট সমবেদনা থাকলেও সে লোকটাকে ঘর থেকে তাড়াবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। রেলকলোনী আর যাই হোক তো বেশ্যাপল্লী নয়। সারারাত এখানে বাইরের লোককে জায়গা দেবার নিয়ম নেই।

টগর বলেছিল, তুমি ওঠো তো। কদিন ধরে এখানে জোর বোমবাজী চলছে। প্রায়ই রাত করে পুলিশ আসে। বাইরের উটকো লোক দেখলে—

গোরাবাবু চটে গিয়েছিল, তুমি আমায় উটকো লোক বললে টগর!

টগর টেনে ওকে দাঁড় করিয়েছিল। গোরাবাবুর কথা সে গায়ে মাখেনি। বলেছিল, সে কথা পড়ে হবে। এখন বাড়ি যাও তো—

আসলে ভয়ের কারণটা অন্যরকমের। রেলকলোনীতে ছিন্তাইবাজ গব্বাবাজের অভাব নেই। গোরাবাবু যে মালদার পার্টি এটা ওদের অজানা নেই। ওরা তক্কে তক্কে আছে। একাচোরা বেমক্কা পেলেই লোকটাকে সর্বস্বান্ত করে তবে ছাড়বে।

টগরের এ আশংকা নিছক অনুমান নয়। সে লক্ষ করেছে—গোরাবাবু তার ঘরে এলেই ওরা আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে। টগরের জন্য এখনো গোরাবাবুর গায়ে আঁচড়টি লাগেনি।

টগর ওদের শাসিয়েছে, সাবধান! যদি কখনো তোরা গোরাবাবুর গায়ে হাত দিস তো খারাপ হয়ে যাবে বলছি। রক্তারক্তি কাণ্ড করে ছাড়ব।

ছিনতাই দলের লীডার হাতকাটা কানাই সে-কথা শুনে বলেছে, তোর যে দেখছি খুব পিরীত লোকটার সঙ্গে। ও কি তোর নতুন ভাতার নাকি রে টগর!

টগর বলেছে, ভাতার হতে যাবে কেন। মানুষটা ভাল। ও না এলে আমার ক্ষতি হবে।

হাতকাটা কানাই হেসেছে, তাই বল্। আমি আবার ভাবলাম—ছেনাল করে বেড়াচ্ছিস দশজনের সঙ্গে। তোর আবার পিরীত কিসের।

শেষমেষ একটা রফা টগর ওদের সঙ্গে করে নিয়েছিল। গোরাবাবুর কাছ থেকে সে যা পায় তার একটা অংশ কানাইকে দেয়।

তবু, ওদের বিশ্বাস কি। ওরা নেমকহারাম! কাল হু'পকেট ভর্তি টাকা ছিল গোরাবাবুর। একে বাইরে কাজলি-ছাই অন্ধকার রাত। তার ওপর মাল খেয়ে বেচাল হয়ে গিয়েছিল লোকটা। সহজে কি কানাইয়ের দল ছেড়ে দেবে। এই আশংকা ছিল টগরের।

অনেক কষ্টে বলে কয়ে একরকম টেনে হিঁচড়ে টগর কাল রাতে গোরাবাবুকে ঘরের বার করে দিয়েছিল।

একটা ট্রেন আসছিল। টগর লাইন থেকে পাকদণ্ডীতে নেমে দাঁড়াল। ট্রেনটা চলে যেতে দেখা গেল ওধারের লাইনে হরেকেষ্ট। ষ্টেশনের দিক থেকে আসছে। হরেকেষ্ট রেলকলোনীতেই থাকে। বছর তুই হল কলেরায় ওর বউ মারা গেছে। রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে যোগাড়ের কাজ করে। প্রায়ই কাজ থাকে না। টগর বললে

বাজার থেকে এটাসেটা এনে দেয়। পরিবর্তে সিকিটা আধুলিটা দিলেই হরেকেষ্ট মহাখুশি।

এধার থেকে টগর গলা ছেড়ে ডাকল, ও হরেকেষ্ট—

হরেকেষ্ট দাঁড়িয়ে পড়ল, ডাকছ নাকি?

টগর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলল, হ্যাঁ.. শুনে যাও—

হরেকেষ্ট কাছে আসতে টগর বলল, ফিরে এলে যে! আজ বুঝি কাজ জুটল না।

হরেকেষ্ট বিরস গলায় বলল, না। যাবার পথেই অযাত্রা। শিবমন্দিরের কাছে একটা লাশ পড়ে আছে।

মেঘের আগল চুইয়ে অল্প রৌদ্র ছিটকে পড়েছে। আকাশের গতিক ভাল নয়। এদিকে সেদিকে ভালুকে মেঘ জড়ো হচ্ছে যে কোন সময় বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে।

হরেকেষ্টর কথায় টগর আশ্বস্ত হল। লোকটা সাদা সরল। ওর কাছ থেকে লাশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

টগর শুধাল, দেখে এলে নাকি মানুষটাকে?

কানের খাঁজ থেকে আধপোড়া একটা বিড়ি বের করল হরেকেষ্ট.. হ্যাঁ, একেবারে সামনেই গিয়েছিলুম—

টগরের প্রশ্নে ভয় উপচে উঠল, আমাদের রেলকলোনীর কেউ না তো?

হরেকেষ্ট বিজ্ঞের মত উত্তর করল, না। রেলকলোনীর লোক হলে চিনতুম—

টগরের কৌতূহল বজবজ করে উঠল, দেখতে কেমন মানুষটাকে?

হরেকেষ্ট বিড়ি ধরাল। চোখ বুজে সুখটান দিল। তারপর দৃষ্টি ভেতরের দিকে গুটিয়ে ভেবে নিয়ে বলল, ফরসা। লম্বা-ধরনের। মোটাসোটা না হলেও ভাল স্বাস্থ্য। মাথাভর্তি চুল। পরণে জামাপ্যান্ট—

টগরের গলা থেকে বুড়বুড়ি কাটার ভঙ্গিতে শব্দ ঠেলে উঠল, বয়স কি রকম হবে?

তখন টগরের মনের ভেতর মেঘ জমতে শুরু করেছে। সে ভাবছিল: লম্বা ফরসা মাথাভর্তি চুল পরণে প্যান্ট জামা—, সবই তো মিলে যাচ্ছে।

এবার হরেকেষ্ট যেন জলে পড়ল। বলল, তা তো বলতে পারব না। থ্যাতলানো মুখ। মাথার চুলে চোখ ঢেকে আছে। তবে বুড়ো মানুষ নয়—

আর কিছু শোনার মত কৌতূহল ছিল না টগরের। সে বলল, ঠিক আছে। তুমি এবার যাও। হ্যাঁ, কালকে একবার আমার ঘরে এসো কিন্তু। মুরগীর একটা খোয়াড় বানিয়ে দিতে হবে।

ওখান থেকে ঘরে পৌঁছুনো অব্দি টগর আর নিজের মধ্যে ছিল না।

খুপরীর ভেতর ঢুকতে গিয়ে বাধা পড়ল। দাওয়া থেকে সুদাম বৈরাগী বলে উঠল, কোথায় গিয়েছিলে টগর?

মন মেজাজ ভাল ছিল না টগরের। জবাব সংক্ষিপ্ত হল, এই একটু রেললাইনের ওদিকে—

বৈরাগী বলল, কখন থেকে বসে আছি। চা হবে একটু।

অন্য সময় হলে টগর খেকিয়ে উঠত। আজ নরম গলাতেই বলল, দিচ্ছি করে—।

দক্ষিণের ঘরে টগর ঢুকল। সাধারণত বৈরাগী এঘরে শোয়। রান্নার পাটও এখানেই হয়। আলাদা রান্নাঘর নেই টগরের। দরকারও হয় না। মোটে তো দুটি পেট।

উনুনের ঝামেলা রাখেনি টগর। জনতা ষ্টোভে রান্না সারে।

ঝটপট ষ্টোভ ধরিয়ে জল চাপাল টগর। ঘুরে ফিরে তার গোরাবাবুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আর সেই সঙ্গে হরেকেষ্টর বর্ণনার সঙ্গে গোরাবাবুকে মেলাতে চাইছিল।

গোরাবাবুকে টগরের ঘরে নিয়ে আসে প্রথম যতীন। যতনীও রেলকলোনীর বাসিন্দা। পাকা রাজমিস্ত্রী। সেই সুবাদে গোরাবাবুর সঙ্গে পরিচয়।

গোরাবাবু যেদিন এই খুপরিতে আসে সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে টগরের। অন্যধারার মানুষ। দলছাড়া।

ঘরে ঢুকে মানুষটা এককোণায় জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। যতীন পরিচয় করিয়ে দেবার পরও গোরাবাবুর সঙ্কোচ কাটেনি।

একসময় একটা ছুতো দেখিয়ে উঠে গিয়েছিল যতীন। আসলে যাতে লোকটার লজ্জা কাটে সেই জন্যেই যতীন চলে গিয়েছিল। যাবার আগে গোরাবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে টগরকে বলে গিয়েছিল। নতুন বাবু নিয়ে এলাম তোর ঘরে। ভালমানুষ। যত্ন-আত্যি করিস কিন্তু, বুঝলি—

রাত তখন মোটে সাতটা। শীতকাল। বিকেলের দিকেই এক পাঁইট দিশি মদ গিলে টং হয়েছিল টগর।

যতীন চলে যাবার পর লোকটা একেবারে যেন পাথর বনে গিয়েছিল।

শেষে টগরই বলেছিল, অতদূরে বসে আছ কেন। কাছে এসো না বাবু—

সে-কথায় গোরাবাবু আরো ঘাবড়ে গিয়েছিল।

টগর ফের বলেছিল, কি ব্যাপার, কথার জবাব দিচ্ছ না যে বড়। আমি সাপ না বাঘ।

গোরাবাবু তখন যেন পঁচিশ হাত জলের তলায়। শ্লেষ্মাধরা গলায় অস্পষ্ট উত্তর করেছিল, না-না, তা কেন।

টগর হেসে উঠেছিল গোরাবাবুর কথায়। বলেছিল, তাহলে কি! লজ্জা করছে। আগে বুঝি কখনো কোন নষ্ট মেয়েমানুষের কাছে যাওনি?

গোরাবাবু তখনো অনড় বসে। টগর বুঝতে পেরেছিল—

তাকেই নড়াচাড়া করতে হবে। গোরাবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, আমাকে বুঝি পছন্দ হচ্ছেনা তোমার?

এরপর গোরাবাবু মুখ খুলেছিল, না, তা নয়। পছন্দ হয়েছে। এম্নি দেখছিলাম তোমাকে—

টগর গোরাবাবুর গায়ে ঢলে পড়ে বলেছিল, এতক্ষণ ধরে আমাকে কি দেখছিলে? আমি কি বিয়ের কনে নাকি!

গোরাবাবু পরিষ্কার গলায় অতর্কিত প্রশ্ন করেছিল, ইস্, কি বিশ্রি গন্ধ তোমার মুখে। মদ খাও তুমি?

টগর অবাক গলায় বলেছিল, হ্যাঁ, খাই বইকি! তাতে হয়েছেটা কি?

গোরাবাবু বোকার মত শুধিয়েছিল, মেয়েমানুষ তুমি। মদ খাওয়া কি ভাল?

টগর বেপরোয়া জবাব দিয়েছিল, জানি। তবু খাই। খেতে ভাল লাগে, তাই—

গোরাবাবুর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠেছিল। বাজে কথা বলছ। মদ একটা সুখাদ্য নয় যে খেতে কারুর ভাল লাগে।

টগর এরপর সত্যকথাটা বলে ফেলেছিল, সবাই এখানে ফূর্তি করতে আসে। তারা বলে তাই খাই। মদ না খেলে ঘরে লোক আসবে না যে—

গোরাবাবু এবার বে-কায়দায় ফেলেছিল টগরকে, কই, আমি তো তোমাকে খেতে বলিনি। তুমি তো দেখছি আগেভাগেই খেয়ে বসে আছ।

টগর একটা যুতসই যুক্তি খুঁজে বের করে ওকে কাটান দিল, তোমার মত ধার্মিক লোক যে আজ আমার ঘরে আসবে একথা কি আগে জানতাম ছাই—

গোরাবাবু জেরার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিল, মদ খেতে সত্যি কি তোমার ভাল লাগে?

লোকটা নাছোড়বান্দা। কোথায় প্রথম দিন এল। একটু রসের কথা বলবে না যত বকরম বকরম—

টগর বলেছিল, প্রথম প্রথম ভাল লাগত না। কিন্তু, এখন মন্দ লাগে না।

গোরাবাবু ফের জোরের সঙ্গে বলেছিল, বাজে কথা!

টগর তেতে উঠেছিল, তার মানে?

গোরাবাবু সরাসরি বলেছিল, মানেটা কি তোমার অজানা? যারা এ ঘরে মজা লুটতে আসে—সত্যি করে বলো তো,—তুমি তাদের ঘেন্না করো না মনে মনে? যা করো সব নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করো। তাইত, মদ গিলে নিজেকে বেহুঁস রাখতে চাও। তাই না?

গোরাবাবুর কথায় টগর চমকে উঠেছিল। ব্যাপারটাকে কখনো সে এতটা তলিয়ে দেখেনি। গোরাবাবুর কথাটা মিথ্যে নয়। টগর বাজারের মেয়েমানুষ নয়। মন বলে একটা পদার্থ আছে তার। খদ্দেরদের সঙ্গে সে ছেনালি করে দায়ে পড়ে। পেটের ভাত জোটানোর জন্যই। আর কিছুটা—দায়িত্বহীন বাবা আর লম্পট স্বামীর দুর্ব্যবহারে জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়েই সে এ কাজে নেমেছে। ফলে, পুরুষজাতটাকে সে ভাল চোখে দেখে না। দেখা সম্ভব নয় বলেই।

গোরাবাবুর প্রশ্নে সেদিন টগরের নেশা চটে গিয়েছিল। গোরাবাবু যে আর পাঁচজন রাতবাবুর মত নয় এটা সে প্রথমদিনের পরিচয়েই ধরে ফেলেছিল।

শুধু কি তাই, মানুষটার আরো এক অদ্ভুত পরিচয় সেদিন সে পেয়েছিল। যে-কারণে, গোরাবাবুকে টগর গোড়া থেকেই অন্য চোখে দেখে আসছে।

সেদিন টগর নিভে যেতে গোরাবাবু নিজের স্বরূপটাকে অকপটে খুলে দিয়েছিল। টগরকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে-ছিল, কি ভাবছ? তোমার কি ধারণা বলো তো। যারাই

এখানে আসে তারা সবাই শুধু তোমার শরীরটা নিয়ে বেলেল্লাপনা করতে আসে, তাই না ?

টগর নিজের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক হতে চেয়েছিল, তা ছাড়া আর কি ভাবব। আমার কাছে কেউ নিশ্চয়ই ধর্ম্ম করতে আসে না।

গোরাবাবু বিমর্ষ হেসেছিল, না, ধর্ম্ম করতে আসবে কেন। তবে, কেউ কেউ হয়ত শুধুই ফুর্তি করতে নাও আসতে পারে।

গোরাবাবুর কথার হেঁয়ালী ধরতে পারেনি টগর। বলেছিল, তাহলে আর কি জন্যে আসবে এখানে।

গোরাবাবু বলেছিল, কেউ কেউ হয়ত দুঃখ ভুলতেও আসতে পারে।

টগর অকরুণ গলায় বলেছিল, ওসব বাজে কথা। দুঃখটুঃখ আবার কি !

গোরাবাবুর যুক্তি ক্ষুরধার হয়ে উঠেছিল, একথা তুমি বলছ। সত্যি করে বলো তো—তোমার মনে কোন দুঃখ নেই। দুঃখ না থাকলে নরকে নামতে পারতে ?

টগর বুঝেছিল—লোকটার সঙ্গে কথায় সে পারবে না। বরং, ওর সব কথার উত্তর দিতে গেলে সে এমন সব কথা বলতে শুরু করবে যাতে সে আরো দুর্বল হয়ে পড়বে।

গোরাবাবু বিলাপোক্তি করেছিল, তোমার যেমন দুঃখ রয়েছে, আমারও তেমনি আছে টগর। দুঃখ না থাকলে, মিথ্যে বলব না, তোমার মত নষ্ট মেয়েমানুষের ছায়াও মাড়াতাম না আমি।

নির্মম হলেও টগর সে-কথায় আহত হয়নি। বরং, গোরাবাবুর খোলামেলা উক্তি তাকে লোকটা সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলেছিল। টগর প্রশ্ন করেছিল, তা তোমার দুঃখটা কি বলেই ফেলো না।

গোরাবাবু মুহূর্তে উদাসীন হয়ে উঠেছিল, আজ নয়। আরেক দিন বলব।

দুঃখ ভুলতে এবং দুঃখের কথা বলতে মানুষটা আবার আসবে—টগর এতটা বিশ্বাস করতে পারেনি সেদিন।

গোরাবাবুর একটা হাত নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে টগর বলেছিল, আবার আসবে, সত্যি বলছ?

গোরাবাবু টগরের মনের ভাবটা ধরতে পেরে বলেছিল, কথা যখন দিয়েছি নিশ্চয়ই আসব। সব পুরুষ মানুষ কি একরকমের হয়। আমাকে একবার বিশ্বাস করেই দেখো না।

ঘর থেকে বেরুবার আগে তিনটে দশটাকার নোট টগরের হাতে গুঁজে দিয়েছিল গোরাবাবু। বলেছিল, এটা রাখো—

তিরিশটাকা! রেলকলোনীর হাফগেরস্থ মেয়েমানুষ টগরের পক্ষে সেটা আশাতীত প্রাপ্তি। তবু, অতগুলো টাকা অযথা নিতে আত্মসম্মানে লেগেছিল টগরের। টগর প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলেছিল, এ টাকা আমি নিতে পারিনা। তুমি কোন ফুর্তিই করলে না—

প্রথমটায় গোরাবাবুর যুক্তিটা দুর্বল ছিল, অনেকটা সময় এখানে বসে গেলাম। তার মূল্য বলে ধরে নেও না টাকা ক'টা।

টগর সবেগে মাথা নেড়েছিল, তা হয় না। তুমি কিছুই করলে না। এ টাকা নিলে আমার অধম্ম হবে।

গোরাবাবু এরপর মোক্ষম যুক্তি হেনেছিল, ঠিক আছে। পারিশ্রমিক বলে টাকাক'টা নিতে যদি তোমার বাধে—তাহলে মনে করো না ভালবেসেই দিচ্ছি।

টগর আর কিছু বলতে পারেনি। মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন টগরের মনে হয়েছিল—ওর কথায় কোন ভেজাল নেই।

চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ঘর থেকে দাওয়ায় নেমে টগর বলল, কই, চা নাও—

সুদাম বৈরাগী হরেন পয়রার সঙ্গে গালগল্পে মশগুল হয়েছিল।

কথা থামিয়ে উঠে চায়ের বাটি হাতে তুলে নিয়ে বৈরাগী শুধোল, একি, তোমার চা কই ?

টগর গা ছাড়া বলল, বাসি কাপড়। চান সেরে তবে খাব।

বৈরাগী বলল, থলিটা এনে দাও। বাজারটা সেরে আসি। বেলা তো কম হল না।

টগরের আজ মন স্থির নেই। উদাসীন গলায় বলল, আজ আর বাজারে যেতে হবে না। ঘরে আনাজ তরকারী আছে। যাহ'ক ছুটো ফুটিয়ে নেব।

টগর দিনকে দিন কেমন বেখাপ্পাধরনের হয়ে উঠছে। ওর মেজাজ-মর্জির তল পায় না সুদাম বৈরাগী। এই বেশ ভাল। চনমনে। হাসিখুসি। প্রাণবন্ত। এই আবার গুম্ মেরে গেল।

বৈরাগী ঘাঁটালো না ওকে। শুধু বলল, চান করবে, জল কোথায়? এনে দেবে ছু'বালতি ?

টগরের স্নানের জল বৈরাগী নিয়ে আসে। রেলগুমতির ও-ধারের টিউবওয়েল থেকে। আগে টগরও দূরের পুকুরে গিয়ে স্নান করত। আজকাল, ঘরে মানুষ আসার পর থেকে, বৈরাগী আর টগরকে পুকুরে যেতে দেয় না। তার ভয় ঃ কে পথেঘাটে ওকে ছুটো কটু কথা বলে দেয়।

টগর আলগা বলল, থাক্। ঘরে ড্রামভর্তি জল আছে। ওর থেকে কিছুটা নিয়ে চান সেরে নেব এখন।

স্নানের ব্যাপারে টগর রীতিমত আয়েসী। রাতের নোংরা শরীর। ভাল করে গায়ে জল না ঢাললে স্বস্তি পায় না। ইদানীং শরীর পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে ওর খুঁতখুতানি বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে।

রান্না আর খাওয়ার জন্যে বাঁচিয়ে ড্রামে যা জল রয়েছে তাতে টগরের গতর ভাল করে ভেজবার কথা নয়। তবু, বৈরাগীকে জল আনতে রেলগুমতির কাছে পাঠাতে সাহস হল না টগরের। লাশটা যদি সত্যি সত্যি গোরাবাবুর হয়, অনেকেই জানে গোরা-

বাবু তার ঘরে আসে,—কেউ যদি বৈরাগীকে সেই তথ্য জানিয়ে দু'পাঁচটা বাজে কথা বলে। বৈরাগী তার জন্য বাইরের লোকের কথা শুনুক—এটা চায় না টগর।

ড্রাম থেকে একবালতির মত জল নিয়ে ছাঁচতলায় চলে এল টগর।

রেলকলোনীর পেছনে বেশ খানিকটা খোলা নাবাল জমি। দূরে দূরে বাড়ি ঘর। অসমান মাটের এখানে সেখানে কয়েকটা ঢ্যাঙা নিস্ফলা নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে। বর্ষার দিন। লম্বা বুনো ঘাসে মাঠ ছেয়ে আছে। সেই সঙ্গে চোরকাঁটার জঙ্গল।

টগরের স্নানের জায়গাটা হরেন পয়রা করে দিয়েছে। প্লাইউডের একবুক উঁচু করে তিনদিক ঘেরা এক চিলতে জায়গা। ভেতরে ঢুকে মাঠের দিকে চোখ মেলতে টগরেব পিত্তি জ্বলে গেল। মাঠের কোণে একটা ছাইরঙা বাড়ি। সেই দোতলা বাড়ির চিলেকোঠায় এক ছোকরাকে দেখা গেল। আজ কয়েক-মাস হল ছোকরাকে ওই ঘরটায় দেখছে টগর।

বোধহয় পড়াশুনো করে। টগর স্নানে এলেই জানালার কাছে চলে আসে। তার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ইশারায় ডাকে। বিশ্রি সব ইঙ্গিত করে। এক একদিন ক্ষেপে গিয়ে টগর চেঁচায়। খিস্তি মারে। মাঠের ওধার পর্যন্ত তার গলা পৌঁছোয় না। ওর চেঁচানিতে ছোকরার জোশ বাড়ে। নানাবকম অঙ্গভঙ্গি শুরু করে দেয় তখন।

আজ আর গা করল না টগব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্লাউজ কাচুলি সায়া খুলল। হিসেব করে গায়ে জল ঢালতে লাগল।

গোরাবাবু কথা রেখেছিল। এসেছিল তার ক'দিন বাদেই। সন্ধেসন্ধি। টগর ঘরেই ছিল। দাওয়ায় উঠে পরিষ্কার গলায় ডেকেছিল, টগর, টগর আছো?

টগর বুঝতে পারেনি যে গোরাবাবু আসবে একলা,

যতীনকে ছাড়াই। সে চুল আঁচড়াচ্ছিল ভেতরে। গোরাবাবুর ডাকে আগল খুলে মুখ বাড়িয়ে অবাক গলায় বলেছিল, ওমা। তুমি হঠাৎ—

গোরাবাবু বলেছিল হেসে, কেন, আমার আসতে বারণ আছে নাকি ?

টগর আগল টেনে গোরাবাবুকে ভেতরে ঢুকবার জায়গা করে দিয়ে বলেছিল, আমি কি সে কথা বলছি। হঠাৎ এলে। আগে থেকে বলা-কওয়া ছিল না কিনা, তাই বলছিলাম—

গোরাবাবু মজা করে বলেছিল, ওরে বাবা, আগে থেকে বলে-কয়ে তোমার এখানে আসতে হবে নাকি। আমি কিন্তু তা পারব না। আগেই বলে রাখছি। আমার যখন ভাল লাগবে তখনই আসব।

এমনধারার পুরুষমানুষ জন্মে দেখেনি টগর। প্রথম দিকে কয়েকদিন তো শুধু এল, এলোপাথাড়ি বকবক করল। আর চলে গেল। আর যাবার মুখে হাতে কয়েকটা বড় নোট গুঁজে দিয়ে গেল। একবারের জন্যও টগরকে স্পর্শও করল না।

শেষে টগর একদিন না বলে পারল না, তুমি আসো, এক গুচ্ছের টাকা দিয়ে যাও। কিছুই করো না। এ আমার ভাল লাগে না গোরাবাবু।

গোরাবাবু হাসিতে রহস্য ফুটিয়েছিল, তোমার লাগে না, কিন্তু আমার যে ভাল লাগে। এই তো, বেশ আসি। গল্পগুজব করি। তুমি মদ গেলো। আমি দেখি। তারপর চলে যাই একসময়—

টগর তেজে উঠেছিল, ভাল লাগেনা ছাই। আর বক্তিমে দিতে হবে না। ভালই যদি লাগবে তবে সারাক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসে থাকো কেন।

সে-কথায় মানুষটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, তুমি ঠিক ধরেছ টগর। সত্যি এখানে এসে আমি যেন কেমন মুষড়ে পড়ি। মন খারাপ হয়ে যায়—

টগর চোখ বড় করেছিল, তাজ্জব কথা ! তাহলে মন খারাপ করবার জন্য এখানে আসো নাকি !

গোরাবাবু উদাস গলায় উত্তর করেছিল, তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না টগর। তবে—তোমার কাছে এসে দুদণ্ড বসে গল্প করলে মনটা হালকা হয় আমার।

টগর ওর কথার হেঁয়ালি ধরতে পারে নি। কিন্তু—লোকটার ভেতরের দুঃখকে বুঝবার চেষ্টা করেছে।

আর একদিন সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, বাড়িতে তোমার কে কে আছে গোরাবাবু ?

গোরাবাবু রহস্য করে বলেছিল, সবাই আছে—

একাধিক প্রশ্ন করে টগর গোরাবাবুকে ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিল, সবাই মানে ! বউ আছে ?

গোরাবাবুর দৃষ্টিতে কৌতুক চলকে উঠেছিল, থাকবে না কেন ?

টগর শুধিয়েছিল, কদ্দিন হল বিয়ে করেছ ?

গোরাবাবু বলেছিল, তা অনেক দিন হয়ে গেল। সতের আঠারো বছর তো হবেই—

টগর জিজ্ঞেস করেছিল, ছেলেপুলে কটি ?

গোরাবাবু নির্বিকার জবাব দিয়েছিল, একটা ছেলে। এখন তার বয়স প্রায় ষোলো—

টগর বলেছিল, মোটে একটা ছেলে ! এত বচ্ছর বিয়ে হয়েছে—

গোরাবাবুর ভাল লাগছিল না এ জাতীয় প্রসঙ্গ। দায়সারা বলেছিল, হ্যাঁ, আর হয় নি। ছেলেটা হবার পর সাবিত্রী মেয়েলি অসুখে ভোগে। জরায়ুর দোষ হয়—

টগর গোরাবাবুর ব্যাপারে ক্রমশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল, তোমার বউ'র নাম সাবিত্রী ? কেমন দেখতে গো ?

গোরাবাবু টগরের প্রশ্নে এতটুকু টলে নি। বলেছিল,—ভালই। এককালে তো রীতিমত সুন্দরী ছিল—

টগর রঙ্গ করেছিল, আমার চেয়েও ?

অনিচ্ছার সঙ্গে গোরাবাবু একবার টগরের গোটা শরীরটা জরিপ করে নিয়ে বলেছিল, সত্যি বলতে কি, তোমার চেয়ে ঢের ঢের সুন্দরী—

উত্তর এত খোলাখুলি হবে টগর বুঝতে পারে নি। মেয়ে-সুলভ অভিমানবশে বলেছিল, ঘরে সুন্দরী বউ রয়েছে। তাহলে আমার কাছে আসো কেন বাবু?

সে-কথায় মুহূর্তে গোরাবাবুর রাঙা মুখখানা থমথমে হয়ে উঠেছিল। বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, সবকিছু থেকেও আমার কিছুই যে নেই টগর!

টগর চোখ কপালে তুলেছিল, তার মানে?

এরপর গোরাবাবু সব পরিষ্কার করে বলেছিল, বউ আজ ক'বছর হল নিত্য অসুখে ভুগছে। রক্তশূন্য। শরীরে একফোঁটা বল নেই। বলতে গেলে শয্যাশায়ী। আর ছেলেটা—

টগর গোরাবাবুর কথার খেই ধরেছিল, ছেলেটার আবার কি হল?

প্রলাপোক্তির মত করে বলেছিল গোরাবাবু, কি আর হবে। বাজে পাল্লায় পড়ে বখে গেছে। যতসব চোর পকেটমারের সঙ্গে ওর দোস্তী। লোকমুখে শুনি—আজকাল নাকি নেশাটেশাও করতে শুরু করেছে—

টগরের ভেতরটা নরম হয়ে এসেছিল, লোক মুখে শোনা, মানে? ছেলে কি বাড়ি থাকে না?

বিষণ্ণ উদাসীন গলায় জবাব দিয়েছিল গোরাবাবু, অনেকদিন হল ও বাড়ি ছাড়া। একবার চুরি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলাম। বাড়িতে নিয়ে আসার পর মারধোর করেছিলাম খুব। সেই যে পালাল—

টগর প্রশ্ন করেছিল, ছেলেটা কোথায় গেল আর কোন খোঁজ খবর নেও নি?

গোরাবাবু ঢোঁক গিলে মনের দুঃখ চাপতে চেয়েছিল, নিয়ে কি লাভ। ও নষ্ট হয়ে গেছে। ঘরে ফিরবার আশা নেই।

সেদিন প্রথম টগর অসহায় মানুষটার প্রতি সদয় হয়েছিল।

চটপট স্নান সেরে প্লাইউডের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এল টগর। চিলেকোঠার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে এখনো সেই ছোকরা অশ্লীল সংকেত করে যাচ্ছে। টগর ব্যাপারটাকে আজ আর গায়ে মাখল না।

ঘরে এসে কাচা শাড়ি পরে রান্নার তোড়জোড় শুরু করে দিল। শরীরটা ক'দিন হল ভাল যাচ্ছে না। রাতের দিকে ভাল ঘুম হয় না। সব সময় মাথাটা ধরে থাকে। গায়ে শীতের চাদরের মত ঘুসঘুসে জ্বর লেগেই আছে। বুকে জোর শ্লেষ্মা জমেছে। কাশলেই ব্যথা করে।

টগর ভাবল—রান্নাটা কোন রকমে সেরে আরেক প্রস্থ ঘুমিয়ে শরীরটাকে ঝরঝরে করে নেবে।

কিন্তু, টগরের সবকাজ কেমন ভজঘট হয়ে যেতে লাগল। চাল ধুতে বসে অযথা কলসীর অর্ধেকটা জল নষ্ট করে ফেলল। জনতা স্টোভটা কিছুতেই ধরাতে পারছিল না। একের পর এক দেশলাইয়ের কাঠি নষ্ট করে ফেলছিল।

আনাজ কুটতে বসে বটিতে আঙুলের খানিকটা ছড়ে গেল। ঘুরেফিরে তার কেবলই গোরাবাবুর কথা মনে পড়ছিল। আর সেই সঙ্গে শিবমন্দিরের কাছের লাশটার কথা। এইসব সাতসতের চিন্তা মশার মত তার ভাবনাকে ছেঁকে ধরতে সে আর ঘরের ভেতর সুস্থির তিষ্ঠোতে পারল না। একসময় ফের বেরিয়ে এল বাইরে।

সুদাম বৈরাগী দাওয়ায় বসে চোখ বুজে আয়েস করে হুঁকো টানছিল। টগর দাঁড়াল না। উঠানে নেমে একসময় রেললাইনে উঠল। তারপর উল্টোমুখো—অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে হন হন করে হাঁটতে লাগল।

কয়েকমাসের ঘনিষ্ঠতায় গোরাবাবুর নাড়িনক্ষত্র সব জেনে গিয়েছিল টগর। বাবা যখন মারা যায় গোরাবাবু তখন মার পেটে। মরেছিল অপঘাতে। সাপের কামড়ে। মার কথাও খুব একটা মনে নেই গোরাবাবুর। মা যখন মারা যায় গোরাবাবুর বয়স তখন মোটে পাঁচ বছর। বাবাকে চোখে দেখেনি মানুষটা।

বাবার মৃত্যুর পরে মার সঙ্গে লোকটা মামাদের আশ্রয়ে মাথা গুঁজেছিল। মামাদের অঢেল জমিজিরেত। বর্ধিষ্ণু চাষী পরিবার। মা-বাপমরা ফ্যালনা ছেলে। দুমুঠো ভাতের জন্য গোরাবাবুকে ছেলে বয়সেই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হত। রাত ফরসা হবার আগে উঠতে হত। দশবারোটা গাইবলদের খাবার জাব দিতে হত। তারপর, লাঠির মাথায় নুন-পান্তাভাতের হাঁড়ি পুঁটলি করে বেঁধে দিনমান ঘুরে বেড়াতে হত মাঠে জঙ্গলে। তার ওপর—কাজে একটু গলতি হল কি লাথি-ঘুসি-চড়তো ছিলই।

এগারো বছর বয়সে মামাদের সংসার থেকে পালিয়েছিল মানুষটা। কত ঘাটের জল খেতে হয়েছে। নৌকোর হাল ধরেছে। যাত্রাদলের সখী সেজেছে। চোতবোশেখে হরগৌরীর দলে ভিড়ে বাড়ি বাড়ি মাগন ভিক্ষে করেছে। গঞ্জে আড়তদারের দোকানে মাল বয়েছে। বিচিত্র জীবনের শেষে বহু মেহন্নত করে একদিন গোরাবাবু নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছিল।

সেইসব দুঃখের দিনে বউ সাবিত্রীও লোকটার পাশে থেকেছে সর্বক্ষণ। তারপর, যখন ভাগ্য ফিরেছে, টাকা পয়সার মুখ দেখতে শুরু করেছে মানুষটা—তখন ভগবান অন্যদিক থেকে তাকে মেরেছে। জীবনে একদিনের জন্য গোরাবাবু সুখের মুখ দেখেনি।

কিছুটা এগুতে হাতকাটা কানাইয়ের সঙ্গে দেখা। দলবল নিয়ে আসছিল।

হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে টগর ওদের মুখোমুখি পড়ল। শুধোল কানাইকে, কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

কানাইয়ের দল উত্তেজিত গলায় কিসব বলাবলি করছিল। সামনে হঠাৎ টগর পথরোধ করতে ওরা থমকে দাঁড়াল।

হাতকাটা কানাই বিরক্ত গলায় বলল, তা দিয়ে তোর দরকার কি। পথ ছাড় বলছি—

টগরের তখন ভিন্নমূর্তি। সে ফুঁসে উঠল, শিবমন্দিরের কাছে একটা লাশ পড়ে আছে। নিশ্চয়ই জানিস তোরা—

কানাইয়ের পয়লা নম্বর সাগরেদ গব্বাবাজ অনুকূল পেছনে ছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, শুনেছি আমরা। তাতে হয়েছে কি—

টগর উত্তেজনায় থরথরিয়ে কাঁপছিল। সে গলা চড়াল, তুই চুপ কর্। তোকে জিজ্ঞেস করেছি আমি! বল্ কানাই। লোকটা কে?

কানাই বলল, আমরা জানব কোত্থেকে। পথ্ ছাড়। জরুরী কাজে যাচ্ছি—

টগর দুহাত ছড়িয়ে ওদের এগুতে বাধা দিয়ে ক্ষিপ্ত গলায় বলল, মিথ্যে বলছিস। নিশ্চয়ই তুই জানিস কানাই। না বললে যেতে দেব না তোদের—

হাতকাটা কানাইয়ের আরেক সাগরেদ মুখ ভেংচে উঠল, কি বললি! যেতে দিবি না গন্ধা মেয়েছেলে! মারব এক ঝাপ্পড়!

টগর তখন দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য। সে ওদের দিকে আর এক পা এগিয়ে এসে বলল, মার না। দেখি তোর কত বড় সাহস।

হাতকাটা কানাই ভীষণ রেগে গেলেও টগরকে পাশ কাটাতে চাইল। বলল, সক্কালবেলা ঝুটমুট ঝামেলা পাকাচ্ছিস কেন টগর। পথ ছাড়্—

টগর এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ঝরঝর করে কেঁদেই ফেলল। বলল, আমি জানি। তোরাই মানুষটাকে শেষ করেছিস। কালরাতেও সে আমার ঘরে এসেছিল। দু'পকেট ভর্তি টাকা ছিল। রাতের অন্ধকারে—

হাতকাটা কানাই হকচকিয়ে গেল। সে বলল, লে বাব্বা! কিসের মধ্যে কি! কে এসেছিল কাল তোর ঘরে! আমি তো কিছুই জানিনা—

টগর বলল, কে আবার! ছুটির দিন করে যে বাবু আসে। গোরাপানা—

হাতকাটা কানাই মাথা নাড়ল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সেই ভদ্দরলোক। যার কয়লা সিমেণ্টের আড়ত আছে তো?

টগর ততক্ষণে মুখ নিচু করে কাঁদতে শুরু করেছে।

কানাই সচকিত গলায় জিজ্ঞেস করল ফের, সেই লোকটা খুন হয়েছে নাকি?

টগরের মুখে কথা জোগাচ্ছিল না।

কানাই বলল, বিশ্বাস কর্ টগর। আমি মাইরি এর কিছুই জানিনা। কাল রাতে আমরা কলোনীতেই ছিলাম না—

টগর হাতকাটা কানাইকে বিশ্বাস করে না। ওর প্রাণে ছিঁটেফোঁটা দয়ামায়া নেই। কানাই একটা জ্যান্ত শয়তান।

হাতকাটা কানাইয়ের দল চলে গেলে টগর অনেকক্ষণ রেল-লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। একসময় টগর কাঁদতে কাঁদতে আত্মগত বলতে শুরু করল: কাল রাতে মানুষটাকে একলা ছেড়ে দিলাম কেন। হে ভগবান্—

## দুই

বেলা একটু বাড়লে পরিস্থিতি অন্যরকম দাঁড়াল। ভোরের দিকে ষ্টেশনের আশেপাশে যেসব ছোট ছোট জটলার সৃষ্টি হয়েছিল—সময় গড়াতে সেগুলো পাতলা হয়ে এল।

শুধু বড় জটলাটা হালকা হল না। অর্থাৎ যে জমায়েতটা প্ল্যাটফরমের দক্ষিণে গড়ে উঠেছিল। তবে সেটা বঙ্কিম সরখেলের আবির্ভাবে সচল হয়ে উঠেছিল কিছুক্ষণের ভেতরেই। জটলাটা কাউন্সিলার সাহেবের নেতৃত্বে উত্তরে এগিয়ে ওভার ব্রীজ পেরিয়ে রেলওয়ে বুকিং অফিসের সামনে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

বড়বাবু তখন ষ্টেশনে ছিলেন না। অত্যুৎসাহী কাউন্সিলার বঙ্কিম সরখেলের নির্দেশে এক যুবক ছুটল বড়বাবুকে ডেকে আনতে। তিনি ষ্টেশনের পার্শ্ববর্তী রেল-কোয়াটারে থাকেন।

যুবকটি কোয়াটারের সামনে এসে হাঁকডাক শুরু করে দিল।

বড়বাবু ঘরেই ছিলেন। সবে সন্ধে-আহ্নিক করে উঠেছেন। গায়ে রেলকোট চাপিয়ে দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে নিম্নমুখে যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ?

যুবকটি ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, বঙ্কিমদা আপনাকে ডাকছেন।

বঙ্কিমবাবুর নাম শুনে বড়বাবু যে আদৌ খুশি হলেন না—এটা তার হাবভাবে বোঝা গেল। কেননা, বঙ্কিমবাবু এক নিষ্কর্মা কাউন্সিলার। তাই, সারাদিন কাজের খোঁজে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করেন। এবং লোকজনদের অতিষ্ঠ করে তোলেন।

বড়বাবু মুখ ব্যাজার করে বললেন, হঠাৎ বঙ্কিমবাবু আমায় তলব করলেন, কি ব্যাপার !

যুবকটি সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য উশখুশ করছিল। সে হড়হড় করে বলে ফেলল, একটা লাশ পড়ে আছে রেললাইনে—

বড়বাবু আর কথা বাড়ালেন না। সংক্ষেপে বললেন, চলো দেখি। সকালবেলা যত ঝামেলা—

ষ্টেশনে উঠে আসতে বঙ্কিম সরখেলের দল বড়বাবুকে ঘেরাও করলেন।

বঙ্কিমবাবু সমবেত জনমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, এই যে বড়বাবু এসে গেছেন। আপনার অপেক্ষাতেই আছি। চলুন একবার—

বড়বাবুর বিরক্তি তখনো কাটে নি। বললেন, কোথায় ?

বঙ্কিম সরখেল বড়বাবুর হাত ধরে টানলেন, চলুন অফিসে। একবার ফোন করবেন। জি-আর-পি হেড কোয়ার্টার্সে। লোকালিটির ভেতর একটা মার্ডার। তাড়াতাড়ি ডেডবডিটা রিমুভ করতে না পারলে উত্তেজনা বাড়বে—

বড়বাবুর শুধু মাথার চুলগুলি পাকা নয়। সেই সঙ্গে তার বুদ্ধিতেও যথেষ্ট পাক ধরেছে। একেই তিনি খচে ছিলেন। সকালের খাবারটা পর্যন্ত খেয়ে আসতে পারেন নি। বললেন, আগে ফোন করব কি। কিছুই তো জানি না!

কাউন্সিলার বললেন, শিবমন্দিরের কাছে একটা মার্ডার হয়েছে—

মনে মনে বঙ্কিম সরখেলের মুণ্ডুপাত করতে করতে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করলেন বড়বাবু। জি-আর-পি হেড কোয়ার্টার্সে ফোন। ফোর্স আসতে ঘণ্টা দেড় দুই সময় লাগবে। তারপর ডেডবডি দেখে কেস-রিপোর্ট তৈরি করবে। তারপর ধাঙড় আসবে। তাদের ডেড-বডি সরাবার জন্য 'বাবা-বাছা' বলে তোয়াজ করতে হবে। সবমিলিয়ে ঘণ্টা তিনেকের ধাক্কা।

বড়বাবু বললেন, আগে চলুন তো দেখে আসি বডিটা। তারপর না হয় ফোন করা যাবে।

বঙ্কিম সরখেল নিমরাজী হয়ে বললেন, তাই চলুন। যেটা ভাল মনে করেন আপনি—

অকুস্থলে গিয়ে লাশটা দেখে বড়বাবু একটা খুঁতসই ছুঁতো খুঁজে বের করলেন নিজেকে বাঁচাবার। বললেন, বুঝলেন বঙ্কিমবাবু, জি-আর-পি ডেকে এক্ষেত্রে কোন লাভ হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

বঙ্কিম সরখেলের কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল, একথা বলছেন কেন ?

বড়বাবু বিজ্ঞের মত করে বললেন, প্রথমত কেসটা রানওভার নয়। সিম্পল্ মার্ডার। তারওপর, লক্ষ করে দেখুন, বডির নিচের দিক ডোবায় নেমে গেছে। ডোবাটা রেল কোম্পানীর এক্তিয়ারের বাইরে। আমার মনে হয় এ কেসটা বেঙ্গল পুলিশের জুরিডিকশনে পড়েছে—

বড়বাবুর যুক্তি অকাট্য। সত্যিই ডোবাটা রেলওয়ে সীমানার বাইরে।

বড়বাবুর কথা শুনে কৌতূহলী জনতার মধ্যে একটা নিরুৎসাহের গুঞ্জন সরব হয়ে উঠল।

বঙ্কিম সরখেল সহজে দমবার পাত্র নন। তিনি যুক্তি দেখালেন, তা ঠিক। কিন্তু, ডেড-বডির মেজর পোরশান যখন রেল কোম্পানীর জায়গায়—

বড়বাবু অধৈর্য হয়ে উঠলেন, ওই যে আগেই আপনাকে বললাম। কেসটা তো রানওভার নয়, মার্ডার। এক্ষেত্রে আমাদের তেমন কোন দায়িত্ব কি থাকে ?

বড়বাবু কাউন্সিলার সাহেবের চেয়ে অনেক ঘোড়েল। বঙ্কিমবাবু তার কথায় কুপোকাৎ হলেন। বললেন আমতা আমতা করে, তা তো বটেই—

কাউন্সিলার সাহেবের হতাশব্যঞ্জক উক্তির পর, যারা সকাল

থেকে উৎসাহের সঙ্গে জড়ো হয়েছিল—তারা খামাকা বেশ কিছুটা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেল—এই ভেবে সরে পড়তে লাগল।

কাউন্সিলার সাহেবও বুঝলেন ব্যাপারটা সাতবাও জলের তলায় রয়েছে। তবু, কথাবার্তায় তিনি অনুৎসাহের ভাব দেখালেন না। বললেন, দেখছেন তো আপনারা। কি ফ্যাচাং। চলুন আমার সঙ্গে কয়েকজন। থানায় যাই—

থানার কথা শুনে অবশিষ্ট যারা ছিল তারা গাঁই-গুঁই শুরু করে দিল। সবাই কাজের অছিলা দেখাতে লাগল। একজন তো স্পষ্টই বলল, ওরে বাব্বা! থানাটানায় যেতে পারব না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। থানায় গেলে দিনটাই মাটি হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত একজন মুস্কিল আসান করল, তাহলে চলুন বঙ্কিম দা,—পোষ্ট-অফিসে গিয়ে থানায় একটা ফোন করা যাক—

সে কথায় সকলে একবাক্যে সায় দিল।

বঙ্কিম সরখেল মাথা নাড়লেন, ঠিক আছে, তাই চলুন—

ততক্ষণে খুনের সংবাদ বসন্তের গুটির মত শহরতলীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা ষ্টেশন কিংবা বাজারের দিক থেকে দুঃসংবাদ বহন করে বাড়ির দিকে ফিরে আসছিল—তারা প্রথমাবস্থায় যথেষ্ট কৌতূহলী হলেও নিজ নিজ পাড়ার ভেতর ঢুকে কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল।

আসলে ব্যাপারটা যেহেতু একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড, তাই বেফাঁস কিছু বললে জল অনেকদূর গড়িয়ে যেতে পারে—এই আশংকায় যথাসম্ভব সংযত থাকার চেষ্টা করল। আবার খবরটা একেবারে বেমালুম হজমও করতে পারল না। ভেতরে ভেতরে তারা উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল। ফলে, খুব গোপনীয়তা রক্ষা করে খবরটা তারা জানাতে লাগল।

খুনের খবর শুনে সকলেই হতচকিত হলেও প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলল না। কেননা, লাশটা যে কার সেটা সনাক্ত হয়নি।

শুধু একদল এ ব্যাপারে সরব হয়ে উঠল। এদের বয়স ষাটের ওপর। খুনের ব্যাপারে সন্দেহের উর্ধে বলেই— এরা লাশ নিয়ে মুখরোচক আলাপ আলোচনা শুরু করে দিল। এইসব বুড়োর দল অবসরভোগী। এদের আড্ডাস্থল বাসরাস্তার দিকে নতুন গজিয়ে ওঠা এক কালীবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ। এরা অকর্মা। আহার নিদ্রা বিশ্রামের সময় ছাড়া এরা বলতে গেলে বাদবাকী সময়টুকু কালীবাড়িতেই গল্পগুজব করে কাটায়। পুরোন দিনের নানা প্রসঙ্গের জাবর কাটা আর পরনিন্দা পরচর্চাই এদের আলোচনার পুঁজি।

বাড়ির চাকরের মারফৎ খবরটা পেয়ে মৈত্রমশাই ছুটে এলেন কালীবাড়িতে। সেখানে অনেকেই মজুত ছিল। মৈত্রমশাই তাদের মাঝখানে জায়গা করে নিয়ে বললেন, দেশের কি হাল —লক্ষ করেছেন। শেয়াল কুকুরের মত লোকগুলো সব কামড়া-কামড়ি করে মরছে—

খবরটা রসিয়ে রসিয়ে পরিবেশন করবেন ভেবেছিলেন মৈত্র-মশাই। কিন্তু, খুনের সংবাদ অনেক আগেই ওখানে পৌঁছে গিয়েছিল। রায়বাহাদুর ষষ্ঠী চাটুজ্জে বললেন, রেললাইনের ধারের মার্ডারের কথা বলছেন তো! সত্যি, মানুষ এখন পশুর অধম। কি একটু মতের অমিল হল অমনি জানে শেষ!

মৈত্রমশাই নিরুৎসাহ বোধ করলেন। খবর প্রথম এখানে পরি-বেশন করার কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলেই। তবু, একবারে দমে গেলেন না। নতুন ছুতো ধরে তেড়েফুঁড়ে উঠতে চাইলেন, হবে না কেন! এখন কি আর অ্যাড-মিনিষ্ট্রেশন বলে কোন পদার্থ আছে! হ্যাঁ, সেসব ছিল ব্রিটিশদের সময়। কোথাও সামান্য একটু কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে লালপাগড়ীর ভিড় জমে যেত—

ষষ্ঠী চাটুজ্জে সব সময় কোন বিষয়ের তল খুঁজতে চেষ্টা করেন। বললেন, আরে সরষেতেই যে ভূত রয়েছে। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টই তো এখন সবচেয়ে করাপ্টেড।

রমেশ ভট্টাচার্য—এদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট। অকালে বউ মরে যাওয়ায় এদের মজলিসে ন্যাড়া বেঁধেছে। উদ্যোগী পুরুষ। কালীবাড়ি সমিতির সেক্রেটারী। সঙ্গে সঙ্গে রায়বাহাদুরের কথাটা লুফে নিয়ে বলল, যা বলেছেন ষষ্ঠীদা। এই তো আমাদের পাড়ার জ্ঞানবাবুদের একতলার ভাড়াটে ছোকরা, একবছরও হয়নি। কি সব বিজনেস ফিজনেস করে। একটা বাচ্চা। কচি বউটাকে ঘরের মধ্যে পিটিয়ে মেরে মাঝরাতে ঝিলের ধারে ফেলে এল। সারা পাড়া পরের দিন পুলিশে গিজগিজ করল। ধরে নিয়ে গেল ছোকরাকে। ওমা, দেখি সেই ছোকরা সেদিনই সন্ধ্যার দিকে দুহাতে দুটো ইলিশমাছ ঝুলিয়ে ড্যাং ড্যাং করতে করতে ঘরে ফিরছে—

ষষ্ঠী চাটুজ্জেকে সবাই মান্য করে। ওর মতামতের মূল্য দেয়। মৈত্রমশাই বললেন, হঠাৎ বলাকওয়া নেই, রেললাইনের ধারে একটা গলাকাটা লাশ। কারণটা,—আপনার কি মনে হয় ষষ্ঠীবাবু?

রায়বাহাদুর কিছু মন্তব্য করার আগে উত্তর দিল সন্তোষ আঢ্য। বলল, কারণটা আর কি হবে। মেয়েছেলে ঘটিত কোন কেলেঙ্কারী হবে নিশ্চয়ই—ওর জ্বালায় ওদের বাড়িতে কোন সোমত্থ ঝি থাকতে চায় না বলে পাড়ায় সন্তোষ আঢ্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে।

সন্তোষ আঢ্যর কথা শুনে নিদন্ত ষষ্ঠী চাটুজ্জে মাড়িতে মাড়ি ঘসে অদ্ভুত আওয়াজ করে বললেন, ঠিক বলেছ সন্তোষ। ব্যভিচার অনাচারে দেশটা ছেয়ে গেছে একেবারে—

পাশ থেকে আশু মোক্তার মাথা নাড়ল, ঘটনা যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা যে একটা প্যালপিবেল্ হোমিসাইড এতে, কোন সন্দেহ নেই। তিনশ' দুইধারার কেস—

মৈত্রমশাই ভেংচে উঠলেন, রাখো আশু তোমার ধারা। আগে কালপিট ধরা পড়ুক। তারপর তো ওসব কথা—

এমন সময় দেখা গেল বাসরাস্তার দিক থেকে ষষ্ঠী চাটুজ্জের বড় নাতনি ছুটে আসছে। বয়স কম হলেও মেয়েটার শরীরের

অস্বাভাবিক বাড় সকলেরই নজরে এল। কাছে এসে নাতনি চেঁচিয়ে বলল, শিগগীরই বাড়িতে চলো দাদু। কাকুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ষষ্ঠী চাটুজ্জে তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে হাতের লাঠিগাছ মাটিতে পড়ে গেল। তিনি হাউমাউ করে উঠলেন, অ্যাঁ, সেকি! দীপেশ আবার কোথায় গেল।

সকলে একযোগে হাঁ হাঁ করে উঠে বলল, সেকি, সেকি!

আশু মোক্তার মাটি থেকে লাঠিটা তুলে ষষ্ঠী চাটুজ্জের হাতে দিয়ে বলল, আপনি ছেলেকে বাড়িতে দেখে আসেন নি ষষ্ঠীদা—

কথাবার্তা বলার ব্যাপারে রায়বাহাদুর যথেষ্ট সতর্ক। কিন্তু, তিনি তখন আর নিজের মধ্যে ছিলেন না। বললেন, দীপেশটা কি আর মানুষ আছে। আজকাল প্রায়ই রাতে বাড়ি ফেরে না—

রায়বাহাদুরের বড় নাতনি দাদুর কথার পাদপূরণ করে দিল, হ্যাঁ, দুদিন হল—

দীপেশের স্বভাবচরিত্র যে সুবিধের নয় এটা এখানকার সবাই জানে। কয়েক বছর আগে লভ্ করে বস্তী থেকে একটা ছোট জাতের মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসেছিল। বাড়ির কেউ মেয়েটাকে ভালভাবে নেয় নি। মেয়েটাও তেম্নি। একদিন স্বামীর ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। সেই থেকে দীপেশ উদ্দণ্ড। মার্চেণ্ট অফিসে ভাল মাইনের চাকুরে। একটা আধলাও ঠেকায় না রায়বাহাদুরকে। মদ গেলে। বেলেল্লাপানা করে সব টাকা ওড়ায়—

মৈত্রমশাই-এর সঙ্গে রায়বাহাদুরের কোনকালেই পটে না। সুযোগ বুঝে তিনি ছোট্ট করে একটা খোঁচা মারলেন, চিন্তার কিছু নেই। দেখুন গিয়ে ছেলে কোন আদারে বাদারে পড়ে আছে—

রায়বাহাদুর চলে যাবার পর আড্ডা আর জমল না। সকলের ঘরেই জোয়ান ছেলেছোকরা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গজল্লা ভেঙ্গে গেল। যে যার বাড়িমুখো রওনা হল।

ঘোঁতনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে কর্কশ গলায় বুম্বা বলল, কিরে, তোরা ঘুমুচ্ছিস নাকি।

ঘরের মধ্যে দুসার বেঞ্চ। মাঝখানে পায়াভাঙ্গা নড়বড়ে একটা টেবিল। কাঠের পাটাতনে সিগ্রেটের টুকরোর ছড়াছড়ি। বেঞ্চে দুজন শুয়েছিল।

বুম্বার ডাকে একজন উঠে বসল। তুড়ি মেরে হাইতুলে বলল, না, একটু গড়াচ্ছিলাম গুরু।

বুম্বা প্রশ্ন করল, লেটোকে দেখছি না যে! ও শালা আবার কোথায় গেল রে পটলা—

ওধারের বেঞ্চের মানুষটাও ততক্ষণে উঠে বসেছে।

এদিক থেকে পটলা বলল, বলে গেল তো শিবমন্দিরের কাছটায় একবার চক্কর দিয়ে আসি—

বুম্বার চোখ মুহূর্তে রক্তবর্ণ ধারণ করল, শিবমন্দিরের দিকে গেছে! কি দরকার ওর লাশের কাছে গিয়ে পোদ ঘসতে যাবার! উল্লুক কাঁহাকা! কিছুতেই ওর ম্যাংটামো স্বভাব গেল না। লাশ কি ওর মাগ্—যে সেটার কাছে গিয়ে ছোঁক ছোঁক না করলেই নয়! কতবার বলেছি—ফালতু এদিক সেদিক যাবি না। শালা কিছুতেই কথা শোনে না—

ঘোঁতন বুম্বার ডান হাত। লেটো লাশ দেখতে গেছে—এ সংবাদে সে আদৌ উৎসাহ বোধ করল না। প্যান্টের পকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের করে বুম্বার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, লেটোর কথা থাক্। ধর্ তো সিগ্রেটটা—

বাজারের পশ্চিমে আনাজ তরকারির দোকান ছাড়ালে চাল-পট্টি। চাল-পট্টির ঠিক আগেই একটা ছোট চায়ের দোকান। সেই দোকানটার গা ঘেঁসে একটা কাণাগলি। গলিটা খুবই সংকীর্ণ। দুটো লোক পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে না। গলির দুধারে সারি সারি চোঙখোলার ঘর। গলিটা এসে শেষ হয়েছে একটা মাঠকোঠার সামনে। সেই মাঠকোঠার

একতলায় পুরোণ শিশিবোতল সরষে আর ডালডার টিনের পাহাড়।

একধারে একটা কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়িপথের শেষে দোতলায় আলোবাতাসহীন একটা ছোট্ট ঘর। ঘরে একটাই মাত্র জানালা। সেটাকে জানালা না বলে ঘুলঘুলি বলাই ভাল।

এই প্রায়ান্ধকার ঘরটা বুম্বাদের অন্যতম মীটিং সেণ্টার। জায়গাটা শুধু নিরিবিলি নয়। লোকচক্ষুর অগোচরেও বটে। বুম্বা দলের সর্দার। বয়স তিরিশের ওপর। বেঁটেখাটো দেখতে। কালচে ছুঁচোলো মুখ। সারা মুখে অজস্র কাটা ছেঁড়ার দাগ। গলায় একটা হাঁসুলি। বাঁ হাতে একটা উল্কি। তাতে ন্যাংটো মেয়েমানুষের ছবি আঁকা। বুম্বার গলার স্বর অত্যন্ত কর্কশ। সবচেয়ে অস্বাভাবিক ওর ভ্রু'দুটো। পুরু, লোমশ। বনমানুষের মত। যা চোখের দৃষ্টিকে আধখানা আড়াল করে রেখেছে।

চাক্ষুষ না দেখলেও এ তল্লাটের ছেলে বুড়ো সকলে ওকে এক ডাকে চেনে। শুধু এ অঞ্চলেই নয়—শহরের গোটা দক্ষিণখণ্ড জুড়ে বুম্বার যথেষ্ট প্রতাপ। ওকে নিয়ে জনশ্রুতির অভাব নেই। বুম্বা নাকি হাসতে হাসতে ছুরি চালায়। খুব ঠাণ্ডা মাথায় বুক থেকে কলজে খসিয়ে নেয়। ফলে, শহরতলীব গণ্যমান্য সাধারণ-অসাধারণ সমস্ত মানুষই ওকে সমীহ করে। পুলিশও পারতপক্ষে ঘাঁটায় না ওকে। ওর পেশা একটাই। গুণ্ডামি আব রাহাজানি। প্রক্রিয়া অবশ্য বিচিত্র। শহরতলীর বড় বড় দোকানদার-ব্যবসায়ীরা ওকে প্রতিমাসে মোটা অংকের টাকা দিয়ে তুষ্ট রাখে। বাজারে চালের কারবার এবং চোলাই মদের কার-বারে নাকি ওর টাকা খাটে। কখনো কারুর সঙ্গে পড়তায় না পোষালে মারপিট খুনখারাবি করে। সেই কারণে বুম্বার শত্রুও অনেক। তবে, তারা ওর তুলনায় দুর্বল।

ঘোঁতনের হাত থেকে সিগ্রেট নিয়ে ধরায় বুম্বা। কয়েকটা টান

দিয়ে ফেলে দেয়। তখনো ওর রাগ পড়েনি। বলে, শালা লেটোটা ফিরুক! আজ ওকে বানাব—

পটলা লেটোর সপক্ষে ঝোল টানতে চায়। বলে, এনিয়ে এত ভাবছ কেন। মালটা ঠিক কোথায় পড়ে আছে—সেটাই দেখতে গেছে লেটো। ও যথেষ্ট হুঁসিয়ার। চোখকান খোলা রেখেই চলা ফেরা করে। ভয়ের কিছু নেই—

বুম্বা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে পটলার কথা উড়িয়ে দিতে চায়, ভয় কোন শালাকেই পায় না বুম্বা। আমি বলছিলাম—লেটোর ওদিকে যাবার দরকারটা কি! ফালতু ঝঞ্চাট বাড়িয়ে ফয়দাটা কি। লাশ কি শালা কখনো দেখেনি—

মুখে স্বীকার করতে না চাইলেও কিছুদিন হল বুম্বা সব ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠেছে। জমানা পাল্টাচ্ছে যে! এখন ভদ্দরলোকের ছেলেরাও পেটো আর যন্তর নিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করেছে। তাদের মদত জোগাচ্ছে বড় বড় পার্টির নেতারা। পুলিশও আর আগের মত নেই। অনেক কমজোরী হয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে থানার এক অফিসার গোপনে বুম্বাকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছিল। বলেছিল: হুঁস রেখে কাজ করবি বুম্বা। দিনকাল ভাল নয়। তোকে অনেকেই খারাপ চোখে দেখে। আমাদেরও আর আগেকার মত ক্ষমতা নেই। এখন একবার ধরা পড়লে কিন্তু সহজে ছাড়া পাবি না—, বুঝলি!

সেই থেকে বুম্বা সমঝে চলছে। সে জেগে ঘুমোচ্ছে। নজর রাখছে চারদিকে। আগুপিছু চিন্তা করে কাজে নামছে। আজ-কাল নানা সূত্রে তার কাছে লোকজন আসছে। নানানধরনের প্রস্তাব দিচ্ছে তাকে। এমন কি রাজনৈতিক দলের মাতব্বরাও তার সঙ্গে দোস্তী করতে চাইছে। বুম্বা যথাসম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগুচ্ছে। সে বুঝতে চাইছে—হাওয়ার গতিটা কোন্ দিকে।

সে-সময় লাশের কাছাকাছি একজনও আর ভদ্রলোক ছিল

না। প্রাতঃভ্রমণ বিলাসী বৃদ্ধের দল অনেক আগেই সরে পড়েছিল। ছিল শুধু সেইসব ঝুটমুটের দল। কিছু কাচ্চাবাচ্চা আর জনা-কয়েক নিষ্কর্মা রেলবস্তীর লোক।

বঙ্কিম সরখেলের আর দেখা পাওয়া গেল না। পোষ্ট-অফিসে গিয়ে থানায় ফোন করার পর তারও উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। কাউন্সিলার সাহেবের একথা প্রত্যয় হয়েছিল যে—লাশটা সরাবার ব্যাপারে অত্যুৎসাহী হবার পরিণতি মোটেই প্রশংসাব্যঞ্জক হবে না। বরং, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুবার সম্ভাবনাই বেশী।

কে জানে কার লাশ, কারাই বা খুন করেছে, নিহত ব্যক্তি অথবা আততায়ী—এদের মধ্যে কেউ যদি তার পরিচিত হয়। তাহলে তিনি সহজে নিস্তার পাবেন না। এইসব সাতপাঁচ ভেবে বঙ্কিম সরখেল পোষ্ট-অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে নিজের পৌরকর্তব্যকর্মে ছেদ টানলেন।

খুনের সংবাদ শহরতলীর গভীরে বিষক্রিয়ার মত ছড়িয়ে পড়লেও অকুস্থলের কাছাকাছি একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। যারা বাজার সেরে দাড়ি কামিয়ে স্নানখাওয়ার পাট চুকিয়ে জিভের ডগায় চুন ধরে অফিস-কাছারীতে যাবার জন্য, প্ল্যাটফরমে এসে জড়ো হচ্ছিল, লাশটা প্রায় চোখের সামনে থাকলেও—তারা এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করল না। বরং, ট্রেন দু'এক মিনিট দেরী করে আসায় অস্বস্তি প্রকাশ করতে লাগল।

গোটা শহরতলীতে একজনই ছিল যথার্থ শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন। বলাই বাহুল্য—সে আর কেউ নয়, ওই মৃতব্যক্তিটি। রৌদ্র-বাতাস আর সময়ের লালনে মৃতব্যক্তিটি ক্রমশ সজীবতা হারাচ্ছিল। গলার ক্ষতস্থানে রক্তের ফুল শুকিয়ে কালচে সরের আকার ধারণ করছিল। পাথরের গুলির মত ঠেলে-ওঠা চোখটা আরো চালসে এবং দ্যুতিহীন হয়ে পড়েছিল। নাকটা ঈষৎ বটে এসেছিল। কপাল ছাপিয়ে নেমে-আসা চুলের জাফরি আরো নিবিড়ভাবে মুখের ওপর লেপ্টে

যাচ্ছিল। অর্ধস্ফুরিত ঠোঁটের ভেতরকার মুখের হাঁ আরো গভীর হয়ে ধরা পড়ল। গাত্রবর্ণ ক্রমশ তামাটে হয়ে আসছিল। এবং শরীর মসৃণতা হারিয়ে শীতলতায় টলটল করছিল। সবমিলিয়ে—লাশটাকে সকালের তুলনায় অনেক নিস্তেজ দেখাচ্ছিল। তবু, একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল। তাহ'ল মৃতব্যক্তির হাওয়াই চটির একপাটি। যেটা শ্রাবণের মেঘক্ষরিত জলে ভরন্ত ডোবার মাঝখানে ভিজে বাতাসের দাপটে অনবরত দোল খাচ্ছিল। ওই চটিটাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল —লাশটা একটা মানুষের। যে কয়েকঘণ্টা আগেও জীবন্ত ছিল।

শেষ পর্যন্ত অকুস্থলের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়েছিল জটাপাগলা। জটাকে চেনে না এহেন লোক নেই এ তল্লাটে। ঢ্যাঙা, রোগা। হিলহিলে চেহারা। পরণে লেংটি। সরু সরু হাত পা। জোরে শ্বাস নিলে বুকের খাঁচার সবক'টা হাড় খটখট করে নড়ে ওঠে। সারা গায়ে পুরু শ্যাওলা জমে আছে। একমুখ গোঁফদাড়ি। মাথা জটাভারলাঞ্ছিত। হঠাৎ দেখলে নাগা সন্ন্যাসী বলে ভ্রম হবে। উদরপূর্তির ব্যাপারে জটাপাগলা অঘোরপন্থী। সুখাদ্য কুখাদ্যে ওর সমান রুচি। অনর্গল কথা বলে। কখনো স্বগতোক্তি করে। কখনো বা চিৎকার করে চারপাশের লোকজনদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। তবে—কারুর কোন অনিষ্ট করে না।

জটাপাগলার কায়েমী বাসস্থান এই জরাজীর্ণ শিবমন্দিরটা। শহরতলীর প্রাচীন বাসিন্দাদের মুখে এখনো কিম্বদন্তীর মত এই মন্দিরটা সম্পর্কে এক রোমহর্ষক গল্প শোনা যায়।

যার সারমর্ম হল—এই শিবমন্দিরটা নাকি এক দুর্ধর্ষ ডাকাত প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে-সব বহু বছর আগেকার কথা। ইংরেজ শাসনের গোড়ার সময়কার কথা। কোম্পানীর আমল তখন। ঘোর রাতে তখন নাকি প্রতিদিন এখানে নরবলি হত।

শিবমন্দির থেকে জটাপাগলা বেরিয়ে আসতে লাশের কাছাকাছি বাচ্চাকাচ্চার দল আর্ত চেঁচিয়ে উঠল ঃ এই রে, জটাপাগলা আসছে। পালা, পালা—

ছেলের দল যে যেদিক পারল ছুটতে লাগল।

জটা ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না। ধনুকের ছিলার মত শরীর বেঁকিয়ে বিরবির করে হাত পায়ের জট খুলতে লাগল। ওর চোখের কোণে পিচুঁটি। সারা গায়ে ধুলো। বোঝা গেল—এই সবে ঘুম থেকে উঠে আসছে জটা।

জটাপাগলা প্রথমে এল ডোবার ধারে। হাটু গেড়ে বসে দু'হাতের আজলায় জল তুলে নিয়ে আচমনের ভঙ্গিতে স্বগতোক্তি করতে করতে চোখেমুখে জল ছিটোতে লাগল।

তারপর, একসময় নিকটবর্তী মৃতব্যক্তির দিকে চোখ পড়ায় ভোল পালটে গেল জটার। মূলোর মত হলুদ দাঁতগুলো বের করে হি-হি করে হাসতে শুরু করল। চোখের গুলি বড় হয়ে চকচক করতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে চলে এল লাশটার কাছে। হাটুতে দু'হাতের ভর রেখে ঝুঁকে বাঁদরের মত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে লাশটার চারপাশে ঘুরল খানিকক্ষণ। তখন, তার মুখচ্ছবি প্রতিক্ষণে পাল্টে যাচ্ছিল। একসময় ঘোরা বন্ধ করে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। থুতু ছেটাল খানিকক্ষণ। তারপর দূর-নিকটের জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, শালা মরেছে। হি-হি। বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে। খাক্ শালাকে শেয়াল কুকুরে! হি-হি-হি—

প্ল্যাটফরমে রেলওয়ে ওভার ব্রীজের নিচে বাঁধানো জায়গায় বসে তখন বেসুরো গলায় সেই বুড়ি রামপ্রসাদের মালসী গাইছিল। অন্যদিনের মত বুড়ি গান থামিয়ে কাতর চিৎকার করে রেলযাত্রীদের কাছে ভিক্ষা মাগছিল না। মাঝে মাঝে তার গান থেমে যাচ্ছিল। তখন বুড়ি গোঙানীর মত আওয়াজ করে বলছিল, আহা রে! কার ঘরের ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। কার সর্বনাশ হল। এবং সে কথা ভাবতে বুড়ির চালসে চোখ দুটো কেবলই জলে ঝাপসা হয়ে উঠছিল।

ছোট্ট চায়ের দোকান। টালীর চাল। দরমা ঘেরা।

জায়গাটা শহরতলীর পূব সীমানায়। এর কিছু পরেই কলকাতার পোর্টাল জোন শেষ হয়ে গেছে।

বাইরে রাস্তার ধারে, কাঁচা নালির ওপর একটা লম্বা বেঞ্চ পাতা। সেখানে কিছু লোক গুলতানি করছে।

রমেন ভেতরে বসেছিল। সামনে স-ধূম চায়ের কাপ। বেলা তখন ন'টার কাছাকাছি।

রমেন এ পাড়ার হালফিলের বাসিন্দা। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে কারখানায় ঢুকেছে বছরচারেক হল। নাইট ডিউটি ছিল। ফ্যাক্টরী বেহালায়। নেক্সট হ্যাণ্ডকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে ফিরতে বেলা হয়। অন্যান্য দিনের মত আজকেও সে বাড়ি-ফেরতা এখানে এসেছে। প্রথম প্রস্থ গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য।

সিগ্রেট ধরিয়ে সবে চায়ের কাপে সে চুমুক দিতে যাচ্ছে—এমন সময় বাইরে সোরগোল বেধে গেল। সে তাকিয়ে দেখল—কোত্থেকে দুটি আঠারো-কুড়ি বছরের ছোকরা ছুটতে ছুটতে বাইরের বেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ওদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। মিহিরদা মার্ডার হয়েছে—

বেঞ্চে-বসা সকলে একযোগে দাঁড়িয়ে উঠে আর্তকণ্ঠে বলল, সেকি, সেকি—

দ্বিতীয় ছোকরাটি হাঁপাচ্ছিল। সে বলল, আমরা এইমাত্র দেখে এলাম। রেললাইনের ধারে মিহিরদার লাশ পড়ে আছে—

দলের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বয়স্ক তিনি বললেন, কোথায়?

প্রথম ছোকরা বলল, শিবমন্দিরের কাছে—

প্রশ্নকর্তা ফের বললেন, তোরা ঠিক দেখেছিস তো?

দ্বিতীয় ছোকরা বলল, হ্যাঁ, সেইরকমই তো মনে হল ব্রজদা—

প্রথম ছোকরা ওকে সমর্থন করল, মিহিরদাকে আমরা চিনব না! বারে!

প্রশ্নকর্তা ওরফে ব্রজদাকে রমেন চেনে। ভদ্রলোক কোন এক রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। রাস্তাঘাটে প্রায়ই দেখা যায়। মিছিলের সামনে থাকেন। পোষ্টার লাগান। মাসের গোড়ার দিকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পার্টির চাঁদা সংগ্রহ করেন।

ব্রজদা গম্ভীর মুখ করে বললেন, তোরা ডেডবডির কাছে গিয়েছিলি?

প্রথম ছোকরা আমতা আমতা করল, না মানে, আমরা ঠিক একেবারে কাছে যাইনি—

দ্বিতীয়জন বলল, কাছে যাওয়া ঠিক হবে না ভেবেই—

'মিহির' শব্দটা শুনেই রমেনের হাতের চায়ের কাপ নড়ে গিয়েছিল। এক চুমুকে সে কাপ শূন্য করে বাইরে বেরিয়ে এল। ব্রজদাকে জিজ্ঞেস করল, কে মিহির? ব্যানার্জিপাড়ার দাশু-উকিলের ছেলে?

ব্রজদা উত্তেজনায় থরথরিয়ে কাঁপছিলেন। সংক্ষেপে জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

কেউ একজন বলল, এ নিশ্চয়ই জগন্নাথদের কাজ। ক'দিন ধরে লক্ষ করছি—ওরা গণ্ডগোল পাকাবার ধান্ধায় আছে। সুযোগ পেলেই আমাদের পোষ্টার ছিঁড়ে দিচ্ছে—

সে-কথা শুনে আরেকজন মারমুখী হয়ে উঠল, খুন কা বদলা খুন। আজ ওদের শেষ করে ছাড়ব—

প্রথম ছোকরা হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, ওদের শায়েস্তা করবার জন্যে আপনাদের কাউকে যেতে হবে না। আমাদের দুজনকে দুটো অস্তর দিন। এখুনি দুচারটা বডি ফেলে আসছি।

ব্রজদা উদ্বাহু হয়ে ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করতে চাইলেন।

বক্তৃতার ঢঙে বলতে শুরু করলেন, আপনারা স্থির হোন। আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় এগুতে হবে। হঠকারিতায় উদ্দেশ্য সফল হবে না। মিহির সান্যাল দলের একজন সুযোগ্য কর্মী। যদি সত্যসত্যই আমরা তাকে হারিয়ে থাকি—তবে সেটা দলের পক্ষে মস্ত একটা দুঃসংবাদ সন্দেহ নেই। তাহলে ধরে নিতে হবে—এই ঘৃণ্য কাপুরুষোচিত কাজ জগন্নাথরাই করেছে। কেননা, ওদের রাজনৈতিক চরিত্রটাই এই জাতীয়। ওরা চাইছে আমাদের দলের বাছাবাছা কর্মীদের হত্যা করে আমাদের মনোবল ভেঙে দিতে। আমরা তা কিছুতেই হতে দেব না। যে-কোন প্রকারে হোক ওদের হাত গুঁড়িয়ে দিতে হবে। তবে, সব দিক বিবেচনা করেই এগুতে হবে আমাদের। কেননা, আপনারা জানেন বন্ধুগণ, আমাদের শত্রু এক নয়, বহু—

ব্রজদা বক্তব্য শেষ করতে পারলেন না। উন্মত্ত শ্লোগানে ওর কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দলটা রাস্তায় পড়ে পূবদিকে এগিয়ে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

চায়ের দোকানী বলল, গতিক সুবিধের বুঝছি না বাবু। মনে হচ্ছে, একটা গণ্ডগোল বেধে গেল বলে—

রমেনের চিন্তাস্রোত তখন একমুখে বইছিল। দোকানীর কথা তার কানে ঢুকল না। সে ভাবছিল: সত্যি কি মিহির মারা গেল! ব্যানার্জিপাড়ার দাশুউকিলের ছেলে! তার আশৈশবের বন্ধু।

ভাবতে গিয়ে রমেনের বুকে যেন একখণ্ড বরফ নেমে এল।

রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত শরীর। তবু, খবরটা শোনার পরেই রমেনের বাড়ি ফেরার ইচ্ছেটা মরে গিয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই মিহির বড় একরোখা। এবং খামখেয়ালী-ধরনেরও। যে-কারণে ওর জীবনটা রীতিমত নাটকীয়। কোন কাজে বেশিদিন লেগে থাকতে পারে না। আজ যেটাকে ভাল মনে

করল—কালই আবার সেটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মত পরিত্যাগ করল।

মাসকয়েক হল মিহির কেমন যেন খ্যাপাটেধরনের হয়ে উঠেছিল। নিজের দল সম্বন্ধে কেউ প্রকাশ্যে বিরূপ মন্তব্য করলে মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ত। তখন লঘুগুরু ভেদজ্ঞান থাকত না। এমন কি দাশুউকিলের মত রাশভারী লোককেও রেয়াত করত না। আনছান যা মুখে আসত বলে দিত। বিরোধী দলের কেউ হলে তো আর কথাই নেই। যুক্তি নয়—আস্তিন গুটিয়ে তর্কের ফয়সালা করত। ফলে, ভিন্ন মতাবলম্বীর মুখোমুখি হলে প্রায়ই বাক্ বিতণ্ডা অচিরে ছোটখাটো সংঘর্ষের পর্যায়ে চলে যেত। তখন রমেন কাছে থাকলে সামলাত। বলত মিহিরকে যে যার মত প্রকাশ করবে। তাই বলে তুই হাতাহাতি করবি!

একমাত্র রমেনকেই সমীহ করত মিহির। উত্তরে মিহির বলত ঃ মতপ্রকাশে তো আমি বাধা দিই নি। তবে, আমার দলকে ব্যঙ্গ করলে ছাড়ব কেন।—রমেন বোঝাতে চাইত ঃ তাই বলে মারামারি করবি ?

এইসব কারণেই দিনদিন মিহিরের শত্রুর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।

মেঘের খিলকপাট ভেঙে গাঢ় রৌদ্রের ঝলক রমেনের বিশ্রাম-কাতর শরীরে বিঁধছিল চোরকাঁটার মত। দোকানী নালির ওপর থেকে বেঞ্চখানা টেনে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। রমেন একটা সিগ্রেট ধরাল।

বছরদেড়েক আগেকার কথা। রমেন গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তখন সবে মিহিরের জীবনে নতুন এক পরিবর্তনের ঢেউ জেগেছে। রমেন বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানত না। বেশ কয়েকদিন পর সে ব্যানার্জি পাড়ায় গিয়েছিল। মিহিরের মা, রাঙাকাকিমা, রমেনকে ভেতরের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সকালবেলা। ঘরে তখন সবাই ছিল। দাশুউকিল, মিহিরের বড়ভাই শিশিরদা, বউদি।

রাঙাকাকিমা বলছিলেন, এ'কদিন তোকেই খুঁজছিলাম রমেন।

রমেন সাগ্রহে বলেছিল, হঠাৎ আমাকে কেন! কিছু হয়েছে নাকি?

রাঙাকাকিমার কণ্ঠস্বর সজল হয়ে উঠেছিল, মিহির তোর কথা খুব মানে রমেন। ছেলেবেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছিস। তুই যদি ওকে একবার বুঝিয়ে বলিস—

রাঙাকাকিমাকে কথা শেষ করতে দেন নি দাশুউকিল; ভারী গলায় বলেছিলেন, কি বললে! তোমার ছেলে মানুষ হয়েছে? মানুষ না একটা আস্ত—

দাশুউকিল স্বল্পভাষী। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সেই দাশু-উকিলকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়তে দেখে রমেন ঘাবড়ে গিয়েছিল।

সে বলেছিল, ব্যাপারটা কি আগে খুলে বলবেন তো?

শিশিরদা মুখ খুলেছিল, তুমি কিছুই জানো না রমেন?

রমেন মাথা নেড়েছিল, না তো।

দাশুউকিল শিশিরদার প্রশ্নের পাদপূরণ করেছিলেন, তোমার গুণধর বন্ধুটি আজকাল দেশোদ্ধারে মেতে উঠেছেন। জোর পলিটিকস করছেন।

—তাই নাকি?—রমেন অবাককণ্ঠে বলেছিল। সংবাদটা সত্যি চমকপ্রদ। অত্যন্ত একগুঁয়ে আর মতিচ্ছন্ন মিহির। রাজ-নীতি করার প্রাথমিক শর্ত হল মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা। যেটা মিহিরের স্বভাববিরুদ্ধ। সেই কারণেই খবরটা অভাবনীয় ঠেকে-ছিল রমেনের কাছে।

শিশিরদা আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল, পলিটিক্স মানে! রাত-দিন পাড়ায় পাড়ায় টোটো করে ঘুরছে। একপাল সাঙ্গপাঙ্গ জুটিয়েছে। স্ট্রীটমিটিং করছে। গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছে। যাকে যা নয় তাই বলছে—

রাঙাকাকিমা শিশিরদার সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলেন, প্রায়ই বাড়ি ফেরে না। স্নানখাওয়া, বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছে। পোড়া-কাঠের মত চেহারা হয়েছে ছেলেটার।

দাশুউকিল ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন, এ আর কি হয়েছে। আরো হবে। আস্কারা দিয়ে ছেলেকে মাথায় তুলেছো,—এখন কাঁদুনি গাইলে কি হবে! এদিকে আমার প্রেষ্টিজ যেতে বসেছে—

দাশুউকিল এরপর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

পরিবেশ একটু শান্ত হয়ে এলে রমেন মিহিরের পক্ষে ঝোল টানতে চেয়েছিল, মিহির রাজনীতি করছে। তাতে এত ঘাবড়াবার কি আছে রাঙাকাকিমা। আজকাল তো অনেকেই—

রাঙাকাকিমা বলেছিলেন, তুই তো ওকে ভাল করে চিনিস রমেন। আর দশজনের মত তো ও নয়। দিনকাল ভাল নয়। শেষটায় কি থেকে কি করে বসে—

রমেন রাঙাকাকিমার আশংকাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল; বলেছিল, অত ভাববেন না রাঙাকাকিমা। হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, পলিটিক্সে নেমেছে। আবার দুদিন বাদেই দেখবেন—

রাঙাকাকিমা দু'হাতে মুখ চেপে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন, তবু তুই যদি একবার ওকে বুঝিয়ে বলিস্—

রমেন শুকনো হেসে রাঙাকাকিমাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিল, ঠিক আছে। দেখছি, কি করা যায় —

কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করার পর রমেন মিহিরকে পাকড়াও করেছিল। বাসরাস্তার কাছে। দলবল নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল মিহির।

দূর থেকে ডাকতে মিহির এগিয়ে এসেছিল।

এক নজর তাকাতেই মিহিরের চেহারার পরিবর্তনটা রমেনের চোখে ধরা পড়েছিল। রোদে ঝলসানো মুখ। গৌরবর্ণ দীর্ঘ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহটা ভেঙে দুমড়ে গেছে। চুল উস্কোখুস্কো। হাতে পায়ে খড়ি জমেছে।

মিহির কাছে এসে বলেছিল, কিরে, কেমন আছিস? আজকাল যে তোকে একদম দেখি না—।—

রমেন তীক্ষ্ণ গলায় বলেছিল, প্রশ্নটা কি তোকেই আমার করা উচিত নয়? জানিস, এর মধ্যে কদ্দিন তোদের বাড়িতে গেছি—

মিহির স্বভাবসুলভ দরাজ গলায় বলেছিল, ঠিক আছে। যেতে দে ওসব কথা। একটা সিগ্রেট ছাড়্ দেখি।

রমেন সিগ্রেট এগিয়ে দিয়ে সমান তীক্ষ্ণতার সঙ্গে বলেছিল, তুই নাকি আজকাল পলিটিক্সে জোর মেতে উঠেছিস?

কসে সিগ্রেটে টান দিতে দিতে বলেছিল মিহির, এ সংবাদটা তোকে আবার কে দিল?

—এই যে বললাম, তোদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।

—তাই বল্। মা বলেছে—

—শুধ্ বাড়ি মাকিমা কেন, কাকাবাবু শিশিরদা বউদি,—সবাই বলেছে।

—আচ্ছা! বাড়িতে তাহলে আজকাল আমাকে নিয়ে জোর কথাবার্তা চলছে, তাই না?

—চললে কি সেটা খুব অন্যায় হচ্ছে?

—ন্যায় অন্যায় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না রমেন। আমার যা ভাল লাগে তাই করব। এতে কে কি বলল তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

—নতুন কথা তুই কি বললি মিহির। চিরদিন তো তোর মুখে ওই একই কথা শুনে আসছি।

—সেটাই তো স্বাভাবিক। আমি নামক ব্যক্তিটি যেহেতু বরাবরই এক এবং অদ্বিতীয়—।—বলতে বলতে মিহির হেসে উঠেছিল।

রমেন নাছোড়বান্দা। বলেছিল মৃদু ধমকের সুরে, বাজে বকিস না। আসলে তুই বড্ড একগুঁয়ে। একবার যেটা ধরবি—

রমেনকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছিল মিহির, আচ্ছা তুই-ই বল্ না। রাজনীতি করার মধ্যে অন্যায়টা কি আছে?

রমেন বলেছিল, ছাখ্ মিহির, ওসব তর্কের মধ্যে আমি যেতে চাই না। রাঙাকাকিমা বললেন। তাই—

মিহির ফের হেসে উঠেছিল, ওহ, তাই বল্। তাহলে তুই মার কুরিয়ার হয়ে এসেছিস আমাকে বোঝাতে?

রমেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, হ্যাঁ, তাই। তাতে দোষটা দেখলি কোথায়।

মিহির মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বলেছিল ভারীগলায় একটা কথা বলব রমেন। যদি কিছু মনে না করিস—

—মনে করার কি আছে।—রমেন প্রস্তুতই ছিল।

—এক সময়, মানে স্বদেশী আমলে, তোর বাবা দেশের কাজে জেলে যান নি?

সরাসরি আক্রমণ। রমেন তাতে মচকায় নি। বলেছিল, সে তো পরাধীনতার আমলের কথা।

মিহিরের কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ ঝরে পড়েছিল, তোর কি ধারণা, এখন আমরা বুঝি খুব স্বাধীন হয়েছি, তাই না?

রমেন বলেছিল, সে কথা কি বলেছি আমি—

মিহির ওর কথা কেড়ে নিয়েছিল, দেশে যতদিন অভাব অনটন অত্যাচার নিপীড়ন থাকবে—ততদিন রাজনৈতিক উত্তাপও থাকবে।

রমেন বলেছিল, কিন্তু তাই বলে পলিটিকস নিয়ে জানপ্রাণ লড়ে যাবার মত সময় কি এসেছে?

মিহির মুহূর্তে খরতর হয়ে উঠেছিল, যা জানিস না তা নিয়ে বাজে ফ্যাচফ্যাচ করিস না রমেন। মোটা মাইনের চাকুরে; বউ ছেলে নিয়ে তোফা সংসার করছিস,—ওই নিয়েই থাক। রাজনীতির তুই কি বুঝিস রে—

রমেনও উষ্ণ হয়ে উঠেছিল, বুঝে কাজ নেই আমার।

মিহির বলেছিল, হ্যাঁ তাই। সময় আবার আসবে ফিরে। সময় তো এসেই গেছে। শুধু তাকে গড়ে-পিঠে তৈরি করে নিতে হবে, এই যা।

রণে ভঙ্গ দিয়েছিল রমেন, যাক্ এ নিয়ে তোর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কাকাবাবুকে দেখলাম তোর ওপর বেজায় খেপে আছেন—

মিহির দুই ভ্রু জোড়া করেছিল, কে, বাবা? বাবার কথা রাখ্। বাবা চিরকালের সুবিধাবাদী। দেদার পয়সা কামাচ্ছেন। জমির স্পেকুলেশান করে সেই পয়সাকে দ্বিগুণ করছেন। আর ব্যাঙ্কে মজুত টাকার অঙ্ক বাড়িয়েই চলেছেন। উনি মানুষের দুঃখকষ্টের কথা কি বুঝবেন।

রমেন মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছিল, রাঙাকাকিমা সেদিন তোর কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন—

ফল হল। একমাত্র মা সম্পর্কেই মিহির মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতর। ও উদাস গলায় বলেছিল, যা বলেছিস। মা বড় অবুঝ। কত বুঝিয়েছি। কিছুতেই বুঝতে চায় না। বাবা আর দাদা ওর কানে আমার সম্পর্কে কি বিষ যে ঢুকিয়েছে—

রমেন নিরুত্তর থেকেছিল।

মিহির নরম গলায় ফের বলেছিল, প্লীজ রমেন, তুই একবার মাকে বুঝিয়ে বল্। সত্যি, আমি কি কোন খারাপ কাজ করছি—

এইখানেই মিহিরের জিৎ। ও নরম হয়ে পড়লে রমেন আর কঠিন থাকতে পারে না।

রমেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল, ঠিক আছে। দেখি কি করা যায়।

প্রসঙ্গটা সেবারের মত চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কাছাকাছি কোথাও প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটতে নিজের মধ্যে ফিরে এল রমেন।

দোকানী ততক্ষণে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

রমেন মনে মনে সিদ্ধান্তটা পাকা করল। একবার এখুনি তাকে ব্যানার্জিপাড়ার দিকে যেতে হবে। ব্রজদাদের অনুমান যদি সত্য হয়—তাহলে তার পক্ষে এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

দোকানী বলল, শুনলেন তো। শিগগীরই বাড়ি চলে যান বাবু।

রমেন দোকানীর কথায় কর্ণপাত করল না। এক লাফে নালা পেরিয়ে রাস্তায় নামল সে। তারপর পশ্চিমমুখো হনহন করে হাঁটতে লাগল।

বোমা ফাটার শব্দে রাস্তার লোকজন এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছিল। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। পা চলছে না। তার ওপর এই মেঘ এই রোদ্দুর। তবু রমেন একবুক শঙ্কা নিয়ে এগুতে লাগল।

আজ দুবছরের ওপর হয়ে গেছে মিহিরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার সূত্রটা শিথিল হয়ে গেছে। বলতে গেলে ব্যানার্জিপাড়া ছেড়ে এদিকে চলে আসার পর থেকেই। রমেনরা এই শহরতলীতে এসেছিল ছেচল্লিশ সালে। পূজোর কয়েকদিন আগে। মধ্য কলকাতার বাসাবাড়ি ছেড়ে। দাঙ্গার সময়। রমেনের বাবা আর দাশুউকিল ছিলেন কলেজে সহপাঠী। তখন সবে রমেনের বাবা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। নিরাশ্রয় বন্ধুকে দাশুউকিল নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিলেন। একতলার ঘরে। তখন রমেনের বয়স কত। চার সাড়ে চার। সেই থেকে সে আর মিহির এক ছাউনির নিচে একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে।

বরাবর দাশুউকিল রাজনীতি থেকে শতহস্তে দূরে থেকে আসছেন। রমেনের বাবা ঘোরতর স্বদেশী ছিলেন। তবু, কেন জানি তার ব্যাপারে কখনোই দাশুউকিল অনুদার নন। ভাইয়ের মত ভালবাসেন রমেনের বাবাকে। এখানে আসার পরে,

দাশুউকিলই চেষ্টাচরিত্র করে তাকে এক সওদাগরী অফিসে চাকরী করিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু কি তাই, রমেনের ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া থেকে এই অঞ্চলে তাদের বাড়ি তৈরি পর্যন্ত—অনেক ব্যাপারেই তারা দাশু-উকিলের কাছে ঋণী। উনি উদ্যোগী না হলে রমেনদের পক্ষে পাকাপাকি ভাবে মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই করে নেওয়া সহজ হত না। রমেনের বাবা বিষয়জ্ঞানহীন আত্মভোলা মানুষ। আজ থেকে চৌদ্দ পনের বছর আগে দাশুউকিল এদিকে রমেনের বাবাকে কয়েককাঠা জমি কিনিয়ে দিয়েছিলেন জলের দামে। তখন এদিকটা ছিল পাণ্ডববর্জিত। ছেলেবেলায়, মনে আছে রমেনের, সরস্বতী পূজোর আগের দিন পলাশফুলের খোঁজে কিংবা ঘুড়ি লুটতে রেললাইনের এধারে সে আর মিহির আসত। তখন এসব জায়গা ছিল খানা-ডোবা বাঁশঝাড় ঝোপ জঙ্গলে দুর্গম। রমেনের বাবার জমি কেনার ব্যাপারে কোন আগ্রহই ছিল না। দাশুউকিল, বলতে গেলে একরকম জোর-জবরদস্তি করেই তাকে রেজেষ্ট্রি অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন: ঠিক আছে। বাড়ি যদি একান্তই না করো তাহলে যে দামে তুমি জমিটা কিনছ সেই দাম না হয় আমিই দিয়ে দেব।—দাশুউকিলের ভবিষ্যৎ-বুদ্ধি প্রখর। শহর কলকাতা দেখতে দেখতে ফুলে-ফেঁপে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল অচিরেই। এখন এখানে জমির দাম আকাশ-ছোঁওয়া।

রমেনের বাবা রিটায়ার করার আগেই ভিৎপূজো করেছিলেন। বাড়িও তৈরি হয়ে গেল একদিন। রমেনের বিয়ের বছরখানেক পরে।

আকাশ ফের মেঘভারে জটিল হয়ে পড়ছে। ফুরফুর করে হাওয়া বইছে। বিনিদ্র, শ্রমতপ্ত শরীর। রমেনের হাঁটার গতি কখন শ্লথ হয়ে পড়ল।

অফিসযাত্রী ছাড়া রাস্তায় তেমন একটা লোকজন দেখা যাচ্ছে না। দূরে নারকেল গাছের মাথায় ঝোড়ো হাওয়ার অশান্ত দাপাদাপি। কোথাও একটা চিল অনবরত ডেকে ডেকে দিনটাকে মেদুর করে দিতে চাইছে।

রৌদ্রহীন মায়াবী দিন। মিহিরের কথা ভাবতে ভাবতে পুরোণ দিনের নানা ছবি-স্মৃতির মধ্যে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিল রমেন।

ছেলেবেলা থেকেই স্বভাবে সামর্থ্যে সে আর মিহির ছিল একেবারে বিপরীত চরিত্রের। রমেন ছিল রুগ্ন। কুনো স্বভাবেরও। বছরে, বলতে গেলে বারোমাসই, ওষুখবিষুখ তাকে কাবু করে রাখত।

আর মিহির ছিল গাট্টাগোট্টা। সারাদিন গায়ে ধুলো কাদা মাখত। ঘরে বাইরে ওর দৌরাত্ম্যে সবাই তটস্থ থাকত।

রাঙাকাকিমা সারাদিন বকে বকে মুখ ব্যথা করে ফেলতেন। মিহির কই গেলি। একি, পা কাটলি কি করে। ওরে শিশির, শিগগীরই আইডিনের শিশিটা নিয়ে আয়। সেই কোন সকালে বেরিয়ে গেছে ছেলেটা। এতবেলা হল। এখনো দাঁতে এক-গোটা দানা কাটে নি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেলেবেলা! শব্দটা রমেন মনে মনে আউড়ে উঠতে তার বুকের ভেতর একটা বাঁশি করুণসুরে বেজে ওঠে। সব মনে আছে তার। অবিকল। অথচ, সেই দিনগুলিকে আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না।

অতীত, যেন অনেকটা, শৈশবে বর্ষার পর মাঠে গিয়ে ঘাসের ডগা থেকে তুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া অপস্রিয়মান ফড়িং-এর মত।

মিহিরের হাতেই রমেনের দুষ্টুমির হাতেখড়ি হয়েছিল।

খুব ছেলেবেলায়, ঘরে বসে দিদির সঙ্গে পুতুল খেলত রমেন। মা বকত। দিদি হাসত। বাবা রমেনের পক্ষ নিত : আহা,

খেলুকই না। যা শরীর ওর। বাইরে রোদে কোথায় ঘুরবে।

মিহির এসে খেপাত : লজ্জা করে না তোর পুতুল খেলতে ?

মা মিহিরকে উসকে দিত : লজ্জা করবে কেন। ও তো আমার ছেলে নয়, মেয়ে। ঝুমরির আদরের ছোটবোন।—ঝুমরি রমেনের দিদির ডাক নাম।

মিহির তাকে টেনে নিয়ে চলে যেত ছাদে। সেখানে গিয়ে নানা রকমের খেলায় মত্ত হয়ে পড়ত দুজনে। সে-সব খেলা অভিনব; মিহিরের মগজ থেকে বেরিয়ে আসা।

কখনো হত নকল যুদ্ধ। রাজায় রাজায়। প্রতিপক্ষ হিসেবে রমেন ছিল দুর্বল। ফলে সেই যুদ্ধ হত একতরফা। রমেন হেরে যেত প্রতিবার। এক একদিন সে বলত : দুর, এসব খেলতে আমার ভাল লাগে না।—মিহির হেসে উঠত। হাততালি দিয়ে ওকে চটিয়ে দিতে চাইত : হেরো, হেরো। ভিতু কোথাকার।—সে-কথায় রমেনের চোখে জল এসে যেত। সে রাগে অভিমানে দিগ্‌বিদিক-শূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত মিহিরের ওপর। প্রাণপণ শক্তিতে কিল চড় ঘুসি চালিয়ে যেত অবিরাম। আশ্চর্য! তাতে এতটুকু ধৈর্যচ্যুত হত না মিহির। প্রতিরোধহীন দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হেসে বলত : সাবাস, এইতো বাপের বেটা !

সে-সময় মিহিরদের বাড়ির পেছনে ছিল এক মস্ত বাগান। বাগানটা ওদেরই ছিল।

একদিন মিহিরের মগজে এক দুর্বুদ্ধি চারিয়ে উঠেছিল। একটা জামগাছের ডাল বাড়ির ছাদে উঠে এসেছিল। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ও বলেছিল, চল্ রমেন। রোজ রোজ রাজা রাজা খেলা ভাল লাগে না। এটা ধরে বাগানে যাই।

প্রস্তাবটা শুনে কপালে চোখ তুলেছিল রমেন, সে কিরে! ডালটা যে ভীষণ সরু !

মিহির বলেছিল, তাতে কি। সরু হলেও জামগাছের ডাল তো, খুব শক্ত।

তথ্যটা রমেনের জানার কথা নয়। গাছটাছে এর আগে সে কখনো ওঠেনি। বলেছিল, বেশি ওস্তাদী করতে হবে না। এদিকে চলে আয়—

মিহির ততক্ষণে কার্নিশ টপকে ডালটা ধরে ফেলেছে।

রমেন আর্তকণ্ঠে পেছু ডেকেছিল, এই মিহির কি করছিস!

কে কার কথা শোনে। মিহির তখন জামগাছের ডালে পা রেখে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

অসহায় রমেন কার্নিশের কাছে ছুটে এসে চেঁচিয়ে বলেছিল, দাঁড়া, কাকাবাবুকে বলে আসছি এক্ষুণি। মজা দেখাব তোকে।

মিহির সমান জোরের সঙ্গে বলেছিল, যা, যা! বলে আয়। আমি কাউকে ভয় পাই না।

ধীরে ধীরে রমেনেরও ভয় কেটে গিয়েছিল। সেবার, গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হলে, ওরা দুজনে সারা দুপুর বাগানেই কাটাত। মিহির বুদ্ধি খাটিয়ে এক মজার খেলা আবিষ্কার করেছিল। খেলার নিয়মকানুন ছিল চমকপ্রদ। বাগানে ছিল অজস্র ফলের গাছ। আম জামরুল আঁশফল জাম সবেদা গোলাপজাম পেয়ারা কাঠ-বাদাম—আরো কত কি। যার দান আসত সে তখন চেঁচিয়ে একটা গাছের নাম বলত। প্রতিপক্ষকে তক্ষুণি সেই গাছের পাতা সংগ্রহ করে যে নামটা বলছে তাকে ধরতে হত। ধরলে তবে সে আউট। এবং তাকে মাটিতে ধরলে চলবে না, ধরতে হবে গাছের ওপরে উঠে।

বলাই বাহুল্য, এ খেলায় মিহিরের সঙ্গে রমেন এঁটে উঠত না। লম্বা লম্বা পা মিহিরের। গাছে চড়ায় ওস্তাদ। তার ওপর নানা কসরৎ জানা ছিল ওর। ফলে, সে পাতা ছিঁড়ে এ ডাল সে-ডাল বেয়ে সহজেই রমেনকে ধরে ফেলত। রমেনের পালা এলে, বেচারী গলদঘর্ম হয়ে উঠত। সে পাতা সংগ্রহ করে তাড়া করতেই

মহির কাঠবেড়ালির মত তরতর করে সহজেই যে-কোন গাছের মগডালে উঠে যেত। একেবারে বিপজ্জনক এলাকায়। সেখানে পৌঁছুনো রমেনের কর্ম নয়। তার সে রকম সাহস কিংবা পটুতা কিছুই ছিল না।

রমেনকে ঘাবড়ে দেবার জন্য তখন মিহির মগডালে উঠে নাচন-কোদন শুরু করে দিত। তাই দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে যেত রমেনের। সে অনুনয়ের সুরে বলত: আমি হার মানছি। তুই নেমে আয় মিহির।—তাতে মিহির আরো মজা পেয়ে যেত। দুপা দিয়ে একটা ডাল জড়িয়ে ধরে বাদুড়ঝোলা হয়ে হেঁটমুণ্ড ঝুলতে ঝুলতে বলত: কিরে, ভয় পেয়ে গেলি নাকি?—রমেন কাঁদো কাঁদো গলায় বলত: মা কালীর দিব্যি, নেমে আয় বলছি।—মিহির হাসত: কালী ফালী আমি মানি না।—রমেন অন্যভাবে প্রলুব্ধ করত: কাল তোকে আইসক্রিম খাওয়াব।—মিহির মাথা নাড়ত: উহুঁ, শুধু আইসক্রিম খাওয়ালে চলবে না, ঘুঘনিও চাই। পটলদার দোকানের ঘুঘনি।—রমেন রাজী হলে নেমে আসত মিহির। রমেন বলত: রোজ রোজ কেবল তোর বদমাইসি। একদিন পড়ে গেলে—।—ছবিটা ভাবতে গিয়ে তার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠত। মিহির হেসে উঠত: পড়ে গেলে কি আর হবে। মরে যাব। মরে গেলে আমার মা-বাবা কাঁদবে। তাতে তোর কি।—রমেনের দুচোখ সে কথায় ছলছলিয়ে উঠত। মিহির ফের বিজ্ঞের মত দুচোখ উদাস করে দিত: মরতে তো সবাইকে একদিন হবেই।—রমেন শেষ অস্ত্রটা ছাড়ত: আর কোনদিন আসব না তোর সঙ্গে এখানে।

সে কথা শুনে জোঁকের মুখে চূণ পড়লে যে অবস্থা হয়—তখন সেই অবস্থা মিহিরের। সে-সময় রমেনকে বাদ দিয়ে ওর একটা দিনও কাটত না। মিহির বলত: ঠিক আছে। তোর কথাই মেনে নিলাম। আর কখনো ভয় দেখাব না।—সেটা ছিল নেহাৎই কথার কথা। পরের দিন ফের নিজমূর্তি ধারণ করত

মিহির। তখন বুঝত না। এখন রমেন বোঝে। মানুষ ইচ্ছে করলেও তার স্বভাবের গতি পাল্টাতে পারে না। মিহির সৃষ্টি-ছাড়া হলেও রক্তমাংসের মানুষ তো।

মনে পড়ে যায় রমেনের, মাঝে মাঝে ছেলেবেলায়, সে মার সঙ্গে মামাবাড়িতে যেত। তার মামাবাড়ি চুঁচুড়ায়। দৌড়ঝাঁপ করেও একদিনের মধ্যে চুঁচুড়া থেকে ফিরে আসা সম্ভব হত না। মিহির বায়না ধরত।—সেও সঙ্গে যাবে।

রমেনের মা এসে বলতেন রাঙাকাকিমাকে, ওকে কিন্তু আজ চুঁচ্ড়ো নিয়ে যাচ্ছি রাঙাবউ।—রাঙাকাকিমা রাজী হতেন না। বলতেন, যা দস্যি ছেলে। শেষে ওখানে গিয়ে এক কাণ্ড বাঁধিয়ে না বসে।—রমেনের মা বোঝাতেন—সে ভয় করিস না। আমি যখন সঙ্গে আছি—।—দাশুউকিল শুনে বলতেন, চুঁচুড়া ফুচুড়া যাওয়া চলবে না। একেই যা ছেলে তোমার। শেষে রেণু বিপদে পড়ে যাবে।—রেণু রমেনের মার নাম। দাশুউকিল বলায় আর রা কাড়ত না মিহির। কিন্তু, রমেনরা চলে যাওয়ার পর বাড়িতে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যেত মিহিরের ইস্কুল খাওয়াদাওয়া ঘুম সব বন্ধ হয়ে যেত। অগত্যা, শেষের দিকে মিহিরও তাদের সঙ্গে যেতে শুরু করেছিল। রাঙা-কাকিমা হেসে রমেনের মাকে বলতেন, তোমার ওপর ওর যা টান রেণুদি,—শেষে ছেলেটা আমার না জানি পর হয়ে যায়।—রমেনের মা উত্তরে বলতেন, এই বুঝেছিস ! আমার জন্যে কি ও চুঁচ্ড়ো যায়। যায়—রমেনকে ছেড়ে থাকতে পারে না তাই।

দাশুউকিলের সঙ্গে কোনকালেই মিহিরের বনিবনা হত না। তিনি রাশভারী মানুষ। কর্মব্যস্তও বটে। সারাক্ষণ মামলা-মোকদ্দমা মক্কেল নিয়ে থাকতেন। এর মাঝখানে পাড়ার

কেউ এসে মিহিরের নামে নালিশ করলে বেজায় চটে যেতেন। ছেলেকে সবসময় হাতের কাছে পেতেন না। তখন তার রাগটা গিয়ে পড়ত রাঙাকাকিমার ওপর। বলতেন, ছেলেটার জন্যে পাড়ায় কান পাতা দায় হয়ে পড়ল যে রাঙাবউ। —রাঙাকাকিমা শুধোতেন, আবার কি হল?—দাশুউকিল বলতেন, এইতো, এই মাত্র যতীন মিত্তির এসে নালিশ করে গেল। তোমার গুণধর পুত্রটি নাকি ওদের বাড়ির ফুলের টবগুলি সব ঢিল মেরে ভেঙে দিয়ে এসেছে।—রাঙাকাকিমা মিহিরের পক্ষ নিতেন, তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছ?—দাশুউকিল বলতেন রুক্ষগলায়, নিজে গিয়ে দেখে আসার কি আছে! যতীন মিত্তির কি মিথ্যে কথা বলবে?—রাঙাকাকিমা আগুনে ঘৃতাহুতি দিতেন, মিথ্যে সত্যি জানি না। তবে লোকেরা অনেকসময় বাড়িয়ে বলে।—সে-কথায় দাশুউকিল গর্জে উঠতেন, আর কদ্দিন ছেলের দোষ আঁচলের আড়ালে ঢেকে রাখবে ছোটবউ। তোমার জন্যেই ও নষ্ট হতে চলেছে। আস্কারা দিয়ে ওকে মাথায় তুলছ। এখনো সময় আছে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছেলেকে ফেরাবার চেষ্টা করো। নইলে, একবার বখে গেলে কিন্তু কেঁদেও কূল পাবে না—বলে দিচ্ছি।

মিহির বাড়ি ফিরলে রূঢ় কথা বলতে পারতেন না রাঙাকাকিমা। সেটা ছিল ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ। চোখ ছলছল করে বলতেন, তুই কি কোন দিন ভাল হবি না মিহির? চিরটাকাল আমায় এম্নি কষ্ট দিবি!—মিহির ভেজাবেড়াল সাজত যেন, আমি কি করেছি মা?—রাঙাকাকিমা ফুঁসে উঠতেন, কি করেছিস জানিস না। আজ যতীন মিত্তিরের বাড়িতে গিয়েছিলি কেন?—উত্তরে আমতা আমতা করত মিহির, না মানে, ওপাড়ার কালো বলল তাই—।—রাঙাকাকিমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠত। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলতেন, তোকে কেউ খারাপ বললে আমার কি ভাল লাগে রে।—মিহির উষ্ণ হয়ে উঠত, আমি খারাপ! কে বলেছে? —রাঙাকাকিমা বলতেন, কে আবার বলবে। এইমাত্র

তোর বাবা বলে গেলেন।—মিহির হাত নেড়ে বলত, বাবার কথা ছাড়ো। বাবা আমাকে দেখতে পারে না। —রাঙাকাকিমা জিভ কাটতেন, ছিঃ, ওকি কথা। উনি তোর গুরুজন না!—ওসব গুরুজন ফুরুজন আমি মানি না মা।—বলেই রেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত মিহির। রাঙাকাকিমা বৃথাই ডাকতেন, ওরে শুনে যা। একটা কথা আছে।—মিহির ততক্ষণে একতলায় নেমে গেছে।

সেবার দাশুউকিলের হাতে বেদম মার খেয়েছিল মিহির। তখন ওরা ক্লাশ নাইনের ছাত্র। বাজারের কাছের এক বস্তীব ছেলে-ছোকরাদের খপ্পরে পড়ে কিছুদিনের জন্য বখে গিয়েছিল মিহির। প্রায়ই স্কুল পালাত। চোরাগোপ্তা সিগারেট ফুঁকত। সিনেমাহলে গিয়ে লাইন দিত। কখনো বা ট্রেনে করে দূর দূর ষ্টেশনে চলে যেত। মারামারি করে রক্তাক্ত হয়ে বাড়ি ফিরত প্রায়ই।

সেদিন গুরুতর একটা অপরাধ করে ফেলেছিল মিহির। সেটা ক্ষমার অযোগ্য। হঠাৎ ফার্ষ্ট পিরিয়ডে জানা গেল ইনসপেক্টর আসছেন তাই টিফিন হবে না। ফিফ্‌থ পিরিয়ড অব্দি একটানা ক্লাশ হবার পর স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। ক্লাশটিচার নোটিশ পড়ার পর মিহির কেমন বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সে এক সময় নিচু গলায় রমেনকে বলেছিল, এই, আজকে সিনেমায় যাবি? রূপালিতে একটা দারুণ টার্জেনের বই এসেছে।—রমেন বলেছিল, আজ, সে কি করে হবে। ফিফ্‌থ পিরিয়ডে ছুটি হচ্ছে। তারপর বেরিয়ে কি ম্যাটিনী শো—।—মিহির ধমকে উঠেছিল, সে আমি বুঝব। তুই যাবি কিনা বল্‌।—রমেন ওকে অন্য দিক থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল, টার্জেনের বই। ঠিক সময় পৌঁছুতে পারলেও কি টিকিট পাবি ভেবেছিস।—আটঘাট সব আগেই বেঁধে রেখেছিল মিহির। বলেছিল, আমি মণ্টুকে বলে রেখেছি। ও গিয়ে আগে লাইনে দাঁড়াবে।—মণ্টু পাড়ার এক মস্তান। রমেন রাজী হয়নি।

সেকেণ্ড পিরিয়ডের মাঝামাঝি সময় 'দারুন জলতেষ্টা পেয়ে গেছে স্যার' বলে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল মিহির। তখনই বুঝেছিল রমেন—একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ঘটেওছিল সেই রকম। কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল হুড়মুড়িয়ে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিল। হেডমাষ্টার অনেক চেষ্টা করেও ছাত্রদের ফেরাতে পারেন নি। সেদিন আর কেউ না বুঝুক, অন্তত দুজন বুঝতে পেরেছিল একাজ কার। এক হেডমাষ্টার আর রমেন।

সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরতে দাশুউকিল ছেলেকে আগা-পাশ-তলা পিটিয়েছিলেন। পিটুনির পর মিহির রেগেমেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। রাত যখন এগারোটা, মিহিব ঘরে ফিরছে না দেখে, কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলেন রাঙাকাকিমা। এবং সেদিনও ওরা রমেনেব শরণাপন্ন হয়েছিলেন। শিশিরদাকে নিয়ে সারা এলাকা চষবার পর মিহিরের সন্ধান মিলেছিল। রেলওয়ে প্ল্যাটফরমে শানবাধানো বসবার সীটে, অন্ধকারে, কোলকুঁজো মেরে শুয়েছিল মিহির। প্রথমে শিশিরদা অনেক করে বুঝিয়েছিলেন। তাতে উল্টো ফল হয়েছিল। মিহির ক্রমশ তেতে উঠছিল। শেষে হাল ধরেছিল রমেন, সত্যি বলছিস, বাড়ি যাবি না?—ক্ষুব্ধ মিহির বলেছিল, বাড়ি? কার বাড়ি? আমার কোন বাড়ি নেই।—রমেন সেদিনও তূন থেকে পুরোণ অস্ত্র ছেড়েছিল, নেইতো নেই। ওদিকে যে রাঙাকাকিমা কেঁদে কেঁদে—।—মার প্রসঙ্গ উঠতে তড়াক করে উঠে বসেছিল মিহির, কেন, মার আবার কি হল?—রমেন ঠিকমতই জাল গুটিয়েছিল, হবে আর কি। কিছু বুঝিস না তুই!

শিশিরদা আগে আগে যাচ্ছিল। মিহির আর রমেন পেছনে। সেদিন রাতে বাড়ি ফেরার সময় বলেছিল মিহির, বুঝলি রমেন, মাকে নিয়েই হয়েছে যত ঝামেলা। নইলে ও বাড়িতে কোন্ শালা যায়— হঠাৎ হাওয়া পড়ে গেল। গুমোট ভাব। আকাশের

গতিক ভাল নয়। শরীরে ঘাম দিচ্ছিল। রমেন দাঁড়িয়ে পড়ল। ফের সিগারেট ধরাল একটা। বাঁ দিকে চোখ পড়তে তার দৃষ্টি একলহমার জন্য ঝাপসা হয়ে এল। এখন ওদিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। নতুন রাস্তা। তার দুপাশে হাল ফ্যাশনের বাড়ির ভিড়। নতুন এক জনপদ গড়ে উঠেছে ওই রাস্তায়।

রমেন নিজের ভাবনার ভেতর একটা ঢিল ছুঁড়ল। আগে, আজ থেকে দশ এগার বছর আগেও ওখানে ছিল মস্ত মাঠ। মাঠের পরে একটা বিরাট পুকুর। সেই পুকুরটার চারপাশে ছিল নানা জাতের ফুলের গাছ। বারোমাস সেখানে কিছু না কিছু ফুল ফুটত। সেই সব ফুল চালান যেত সহরে। পুকুরের ঘাট ছিল শান বাঁধানো। মনে পড়ে যায় রমেনের—কত গ্রীষ্মদিনের দুপুরে, সে আর মিহির ওই পুকুরে নেমে স্নান করে দুচোখ টসটসে লাল করে বাড়ি ফিরেছে। সে-সব খুব বেশিদিনের কথা নয়।

লাগোয়া মাঠটায় এ অঞ্চলের ফুটবল টুর্নামেণ্টের আসর বসত। এপাড়া সেপাড়া থেকে নানান দল খেলতে আসত। ফুটবলার হিসেবে মিহিরের একসময় জুড়ি ছিল না। খেলত রাইট ইন্-এ। অসম্ভব সিন্সিয়ার ছিল। আর ছিল ভয়ঙ্কর ডেয়ার ডেভিল। ছুটত একরোখা। বুনো শূয়োরের মত। থামতে জানত না। জান লড়িয়ে খেলত মিহির।

একসময় কলকাতার সিনিয়ার ডিভিশনের এক মোটামুটি মাঝারি ধরনের টিমেও মিহির খেলেছিল কিছুকাল। কয়েক মাসের মধ্যেই যথেষ্ট সুনামও কুড়িয়েছিল।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। খামখেয়ালী ধরনের ছেলে। মরশুমে শেষের দিকে এক খেলায় টিমের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের খেলোয়াড় জীবনের ছেদ টেনেছিল মিহির।

ঘটনাটার কথা স্পষ্ট মনে আছে রমেনের। একটা ছোট টিমের সঙ্গে খেলা হচ্ছিল। রমেন সেদিন মাঠে গিয়েছিল। খেলা শুরু হবার কিছুক্ষণের ভেতরেই মনে হয়েছিল মিহিরদের

টীমটা ঠিকমত নড়ছে চড়ছে না। অযথা বেশিক্ষণ বল পায়ে রাখছে। কিংবা সাইডে পাঠিয়ে দিয়ে সময় নষ্ট করছে। গোটা টীমে একমাত্র মিহিরই যা দৌড়ঝাঁপ করছিল। বলতে গেলে একার চেষ্টাতেই সেণ্টার লাইন থেকে বল টেনে নিয়ে মিহির দু-দুটো গোল দিয়েছিল। তারপর, ঠিক খেলা শেষ হবার আগে, ব্যাপারটা ঘটল। মিহিরের পায়ে বল। পেনাল্টি এরিয়ার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। দুজন ব্যাককে চুক্কি দিয়ে। গোল অবধারিত। এমন সময় দেখা গেল, ওদেরই টীমের সেণ্টার হাফ, গোপাল মুখার্জি, যে টীমের ক্যাপ্টেনও বটে, ছুটে এসে মিহিরকেই ড্যাস করে মাটিতে ফেলে দিল। বলটা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে মিহির ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ গোপাল মুখার্জিকে জার্সির কলার চেপে ধরে দমাদ্দম ঘুসি চালাতে শুরু করল। ঘটনা আরো অনেকদূর গড়াত। যদি না টীমের কর্মকর্তারা ছুটে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ত।

তারপর, আর কোনদিন মিহির ফুটবলে পা ঠেকায় নি। টীমের সেক্রেটারী একাধিকবার বাড়িতে হানা দিয়ে মিহিরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। ফল হয় নি কিছুই। সেবার রমেন বেজায় ক্ষেপে গিয়েছিল মিহিরের ওপর। সে বলেছিল, এসব গোয়ার্তুমির কোন মানে হয়! শুনলাম তুই নাকি আর খেলবি না?— মিহির খুব সহজস্বরে উত্তর করেছিল, হ্যাঁ।— রমেনের প্রশ্ন, কেন?— মিহির বলেছিল, তুই আমার লাষ্ট গেমটা দেখেছিলি?— রমেন মাথা নেড়েছিল, হ্যাঁ। যে গেমটায় তুই ক্যাপ্টেনকে ধরে মেরেছিলি, সেটা তো?— মিহির রেগে গিয়েছিল, চমৎকার! আমার মারাটাকেই বড় করে দেখলি! কিন্তু গোপাল যে আমাকে পেছন থেকে ডাশ করেছিল, সেটা তোর চোখে পরে নি?—রমেন বলেছিল, যাই করুক। তাই বলে তুই দলের ক্যাপ্টেনকে ধরে মাঠের ভেতরে মারবি?—মিহির গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, সেটা হয়ত অন্যায়ই করেছিলাম। কিন্তু, তুই আগাগোড়া গেমটা লক্ষ্য

করেছিলি ?— রমেন বলেছিল, হ্যাঁ। কেন ? —মিহির বলেছিল, বুঝতে পারিস নি, গেমটা ছিল গট্‌আপ। টেণ্ট থেকে মাঠে ঢুকবার আগেই ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট প্রত্যেক প্লেয়ারকে বলে দিয়েছিলেন, আজকের গেম সিরিয়াসলি নেবে না। আজকে ওরা আমাদের কাছে হেরে গেলে সেকেণ্ড ডিভিশনে নেমে যাবে কিন্তু। বুঝলে! সবাই কি বুঝেছিল জানি না। আমি কিন্তু সিরিয়াসলি খেলেছিলাম। দুটো গোলও দিয়েছিলাম। সেই রাগেই গোপাল আমাকে—।—রমেন ওর কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল, তোরই বা এমন কি দরকারটা পড়েছিল গোল দেবার। যখন টীম চাইছে না—।—মিহির বলেছিল, সেই জন্যেই তো খেলা ছেড়ে দিলাম রে।—রমেন অবাক হয়ে গিয়েছিল, তার মানে ?—মিহির হেসে উঠেছিল, মানেটা খুবই সহজ রমেন। নোংরামি আমার ভাল লাগে না। অথচ খেলতে গেলে এসব নোংরামিতে জড়িয়ে পড়তেই হবে। কারোর মুখ চেয়ে খেলতে রাজী নই আমি। তারচেয়ে বরং খেলব না।

জীবনটাকেও বরাবর খেলার মাঠ হিসেবেই ধরে নিয়েছিল মিহির। কোন মালিন্যকে বরদাস্ত করেনি কখনো। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বারবাব এগিয়ে গেছে হাসতে হাসতে। পেছোয়নি কখনো। এমন বেপরোয়া ছেলে এদেশে মেলাই ভার। সাচ্চা স্পোর্টসম্যান মিহির। একঘেয়েমি ওর ধাতে সইত না। ফলে, নতুনত্বের স্বাদ পাবার আশায় ওর জীবনে কত যে পরিবর্তন এসেছে। পড়াশুনায় দুষ্টুমির মতই সমান মাথা ছিল। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ভালভাবেই পাশ করেছিল। তারপর, কলেজে ঢুকে একদিন হঠাৎ না বলেকয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিল। এব্যাপারে ওর যুক্তিটা ছিল যথেষ্ট ধারালো। ভাল ছেলে হয়ে ছা-পোষা গৃহস্থের মত বাঁচতে চাই না আমি। ভয়ঙ্কর রকমের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মিহির। যে কারণে, হরিহরআত্মা হলেও, রমেনকে সুযোগ পেলে আক্রমণ করত। বলে ঃ আমাকে আর

জ্ঞান দিতে হবে না। বউয়ের আঁচল ধরে ঘর সংসার করগে যা।
—ছকে-বাঁধা জীবনের ওপর ওর দারুণ বিতৃষ্ণা।

লেভেল ক্রসিং-এর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রমেন। তখনো এখানে সেখানে ছোট ছোট জটলা চাঁক বেঁধে আছে। প্ল্যাটফরমের অপরপ্রান্তে শিবমন্দির। শিবমন্দিরের কাছাকাছি কোথায় লাশ পড়ে আছে এধার থেকে দেখা যায় না।

রমেন একবার ভাবল কোন একটা জটলায় ভিড়ে যাবে কি না। হয়ত তাতে মিহিরের মৃত্যু সম্পর্কিত খবরটা সে সঠিক জানতে পারবে। পরমুহূর্তে নিজের মত পাল্টে ফেলল। খবরটা যদি সত্যি হয় তাহলে হয়ত সে ব্যানার্জিপাড়ায় পৌঁছুতেই পারবে না। ক্লান্তিতে, উত্তেজনায় অবসিতপ্রায় তার শরীর মন।

মিহির লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে ডাইনে বাজার রেখে এগুতে লাগল। চিলটা যেন তার পেছনে লেগেছে। অনবরত করুণ সুরে ডেকে যাচ্ছে। কম্পজ্বরের মত সারা শরীরে কাঁপুনি ধরল রমেনের। আর কণ্ঠনালীর ডগায় একখণ্ড শ্লেষ্মা বেয়াড়াভাবে আটকে আছে। গলাখাকারি দিয়েও সে শ্লেষ্মাটাকে বুকে টেনে নিতে পারছিল না। বরং, সেই চেষ্টা করতে শ্বাসকষ্ট বোধ তার হল।

বাজার ইস্কুল: কালীবাড়ী সিনেমাহল ছাড়িয়ে ডানদিকের রাস্তায় পড়ল রমেন। এই রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেকের মত হাঁটার পর ব্যানার্জিপাড়া।

রাস্তার মোড়ে একটা গোলাপীরঙের দোতালা বাড়ি। বাড়িটার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রমেন। চোখ মেলে তাকাতে দেখল—সবকিছুই আগেকার মত আছে। দোতালায় ঘোরানো ঝুলবারান্দায় লতিয়ে ওঠা বোগানবুলিয়ার ঝাড়, জানালায় চেকনাই পর্দা, বারান্দার দেওয়ালে ঝুলন্ত নীলগাইয়ের মাথা, গেটের বাঁ-ধারে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা 'চামেলীকুঞ্জ'—সব। পাঁচবছর আগের মতই।

রমেনের বুকের গভীরে ভারী শেকল ঘরঘর শব্দে ফেলে কেউ যেন নোঙর করছিল। সবকিছু অবিকল অক্ষত থাকলেও একজন নেই ওই বাড়িতে। যার দুচোখ, যেন কেউ ধারালো ছুরি দিয়ে আলতো করে পাতা কেটে বের করে দিয়েছে। মুখখানা পানপাতার মত। নাকের ভাঁজে একটা ছোট্ট তিল। এক জোড়া বেণী মেয়েটার পিঠের ওপর খেলত। আর হাসিটা ছিল, যেন শরতের মেঘভাঙা একঝলক রোদ্দুর। যার নাম শিউলি। কারণে অকারণে ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াত মেয়েটা। সারাদিন জানালার আড়ালের আবছায়া থেকে ওর দুজোড়া চোখ একটা মানুষকে খুঁজে বেড়াত। সেই মানুষটা মিহির।

মিহিরকে ভালবেসেছিল শিউলি। মিহির প্রথমদিকে পাত্তাই দিত না শিউলিকে। বরং, অকরুণই ছিল ওর প্রতি। শিউলি তাতে হাল ছাড়ে নি। রাস্তাঘাটে বাড়ির কাছাকাছি—যখন যেখানে মিহিরকে মুখোমুখি পেয়েছে—এগিয়ে এসে কথা বলেছে। ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে।

সেই শিউলি মারা গেল হঠাৎ। তিনদিনের জ্বরে। মাথায় রক্ত উঠে।

শ্মশান থেকে ফেরার পথে মিহির একবারই মুখ খুলেছিল। বলেছিল, মরে গিয়ে বেঁচে গেল। নইলে, শালা আমার মত বাউণ্ডুলের ঘাড়ে চেপে বসলে মেয়েটাকে সারাজীবন কষ্ট পেতে হত।

সেদিনই, মাত্র একবারের জন্য রমেন মিহিরকে চোরা কাঁদতে দেখেছিল।

মিহিরদের বাড়ির কাছে এসে রমেন কিছুক্ষণের জন্য গাছের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। শুধু তার দৃষ্টি ছিল চলন্ত। সে আঁতিপাতি করে বাড়িটাকে জরিপ করছিল দূর থেকে।

না, কান্নাকাটি চিৎকার চেঁচামেচি—কিছুই সে শুনতে পায় নি। বরং অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি শান্ত মনে হয়েছে বাড়িটাকে।

দোতলায় উঠে এসে কলিং বেল টিপতে শিশিরদার বউ দরজা খুলল।

রমেনকে দেখে বলল, আরে, রমেন ঠাকুর পো যে! অনেক দিন বাদে। কি মনে করে?

নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলবার জন্য রমেন উত্তর করল, কি মনে করে আবার। এম্নি। আজকাল এ বাড়িতে আসতে হলে কি কারণটারণের দরকার হয় নাকি?

বউদি বললেন, তা কেন। ভেতরে এসো।

এটা মিহিরদের বসার ঘর। রমেন একটা চেয়ারে বসে পড়ল, রাঙাকাকিমা কোথায়?—কথাগুলো ঠিকঠাক বললেও রমেনের কানছুটো সজাগ ছিল।

বউদি বললে, ঠাকুর ঘরে আছেন। চা খাবে তো?

রমেন চাপা নিশ্বাস ছাড়ল, না, পারলে এক গেলাস জল দাও।

ভেতরের ঘরে চলে যাবার আগে বউদি পরিহাস করলেন, সেকি, অমৃতে অরুচি! বোসো আনছি।

চোখের সামনে দেয়াল ঘড়িটা শব্দ করে ঘর পাল্টাচ্ছে। রমেনের মাথার ভেতরে বিছ্যুৎ চলকাচ্ছে। সে ভাবল: খবরটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িতে এসে পৌছোয় নি। পৌছুলে—। তারপর আর ভাবতে পারল না রমেন।

জল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন রাঙাকাকিমা। রাঙাকাকিমাকে বয়সের তুলনায় ভারী লাগছিল। মুখে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে গেছে। সিঁথির ছুপাশের সব চুলই পেকে গেছে। দৃষ্টি ঘোলাটে। বিষণ্ণ, উষ্ণতাবিহীন মুখ।

রাঙাকাকিমা পরিচিত ভঙ্গীতেই হেসে বললেন, কেমন আছিস রমেন? বাড়ির সবাই ভাল তো?

রাঙাকাকিমার চোখে চোখ পড়তে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল রমেনের। যদি সে ধরা পড়ে যায়—এই ভয়ে।

মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে রমেন জবাব দিল, হ্যাঁ রাঙা-কাকিমা। সেই মুহূর্তে একটা কথা মনে পড়ে গেল তার।

তথ্যটা মিহির জানে না। রমেনও জানত না এতকাল। কিছুদিন আগে সে মার কাছে শুনেছে। রাঙাকাকিমা শিশিরদা কিংবা মিহিরের আসল মা নন। মিহির যখন সাত আট মাসের তখন ওর মা মারা যায়। মা মরা দুধের বাচ্চা মিহিরের পালন-পোষণের জন্য দাশুউকিল রাঙাকাকিমাকে বিয়ে করে ঘরে আনেন। ব্যাপারটা বানানো গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ। রাঙা-কাকিমা ছিলেন দাশুউকিলের এক মক্কেলের মেয়ে। সব জেনে-শুনেই রাঙাকাকিমা এই সংসারে এসেছিলেন। বাসররাত্রে তিনি স্বামীকে দিয়ে দুটি শর্ত কবুল করিয়ে নিয়েছিলেন। প্রথম শর্ত—রাঙাকাকিমার কাছে তিনি কখনো সন্তান কামনা করতে পারবেন না। অর্থাৎ রাঙাকাকিমা মা হবেন না কখনো।

দাশুউকিল তো অবাক। কোন মেয়ে কি স্বেচ্ছায় নিঃসন্তান থাকতে চায়! চেয়েছিলেন, থেকেও ছিলেন রাঙাকাকিমা।

এর পেছনে কারণ ছিল একটাই। মা হয়ে গেলে তিনি যদি শিশির-মিহির সম্পর্কে বিরূপ হয়ে পড়েন —তাই।

দ্বিতীয় শর্ত—শিশির মিহিরের ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে তাদের নতুন মার, দাশুউকিলের নয়। রাঙাকাকিমা সম্পূর্ণ নিজের মনোমত করে ছেলেদের মানুষ করবেন। এব্যাপারে ওদের বাবার কিছু বলার অধিকার থাকবে না।

অনিচ্ছার সঙ্গে শেষপর্যন্ত দাশুউকিল রাঙাকাকিমার শর্ত দুটি মেনে নিয়েছিলেন সেই রাতেই।

রাঙাকাকিমা বললেন, হ্যাঁরে রমেন, তোর ছেলেটাকে একদিন এখানে নিয়ে আসতে পারিস না? কতকাল দেখি না ওকে।

রমেনের বুকের ভেতর তখন কেউ যেন হাতুড়ির ঘা মারছিল। ভাবছিল: এই বুঝি কেউ এসে পড়ল দুঃসংবাদটা নিয়ে।

সে দায়সারা বলল, ফ্যাক্টরীর কাজ। বেয়াড়া ডিউটি। একদম সময় পাই না—

বাইরে কোথাও তখনো চিলটা একটানা বিশ্রি করুণ-সুর ডেকে যাচ্ছিল।

রাঙাকাকিমা বললেন, দূরে চলে গেলে কি এমন পর হয়ে যেতে হয় রে। তুই না পারিস, সোনালি অন্তত ছেলেটাকে নিয়ে একবার তো এদিকে আসতে পারে। সোনালি রমেনের বউ।

রমেন নিজেকে উষ্ণ করার জন্য বলল, কেন, তুমি পারো না একবার আমাদের বাড়িতে যেতে। তোমার এখন কি এমন কাজ যে—

মুহূর্তে মলিন হয়ে গেলেন রাঙাকাকিমা। বললেন টেনে টেনে, পারব না কেন। এমন কিছু গাড়ীঘোড়ার পথ তো নয়। সবই আমার অদৃষ্ট রমেন। মিহিরটা আমাকে যা জ্বালাচ্ছে। ওকে নিয়েই ভাজা ভাজা হয়ে গেলাম। এখন আর কারুর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না রে। এমন কি, ভবানীপুরে গিয়ে যে একবার বুড়ো মা বাপকে দেখে আসব—তাও মন চায় না।

হাতুড়ির ঘা দ্রুততর হয়ে উঠল। রমেন বুঝল—এই সুযোগ। সে জিজ্ঞেস করল, মিহির কি বাড়িতে আছে?

—বাড়িতে! তুই কি কিছুই জানিস না। ও আজ মাস-দুয়েক হল বাড়ি আসে না। পার্টির এমনই নাকি কাজ—

—শেষ কবে এসেছিল?— রমেনের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

—দিন চারেক আগে।—রাঙাকাকিমা বললেন।

সিঁড়ি দিয়ে কেউ কি দোতলায় উঠে আসছে? রমেনের হৃদকম্প শুরু হয়ে গেল। সে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, আজ চলি রাঙাকাকিমা—

—সে কি! সকালের দিকে এলি। কিছু না খেয়েই চলে যাবি কিরে?

—আজ নয়। জরুরী কাজ আছে। আরেক দিন আসব।—রমেন দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বাইরে এসে দেখল—বউদি কাপড় শুকুতে দিয়ে ছাদ থেকে নেমে আসছে। ঘন করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল রমেন।

ব্যানার্জিপাড়া থেকে সর্টকাট রাস্তা ধরে বাজারের পথে চলে এল রমেন। আকাশ আরো ভারি হয়ে উঠেছে। ছাই রঙের মেঘ নিচের দিকে নেমে এসে ছুটোছুটি করছে। রমেনের চিন্তার ভেতর তখন যেন কেউ দ্রুত লাটাইয়ে সুতো গোটাচ্ছিল।

শিউলি মারা যাবার পর মিহির কেমন বেচাল হয়ে পড়েছিল। খেলা ছেড়ে দিয়েছিল আগেই। আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশত। মাঝে মধ্যে মদ খেত। জুয়োর আড্ডায় গিয়ে জমত।

সেই সুযোগটা নিয়েছিল দল। বেপরোয়া মারকুটে যুবক। হাতে পাঁচদশটা ছেলে আছে। যারা মিহিরের কথায় জান দিতে পারে। এরকম ছেলেকে দলে টানতে পারলে খুব সুবিধে। তাতে দলের শক্তি সামর্থ্য বাড়ে।

সহজেই টোপ গিলেছিল মিহির। যেটা ওর স্বভাব। বড় আবেগ প্রাণ। ফলাফল বিবেচনা করে কোন কাজ কোনদিন করে নি মিহির।

রাজনীতির মধ্যে একটা উত্তাপ আছে। সে উত্তাপ আদর্শের। শুধু মস্তানিতে যে উত্তাপ নেই। যে-কারণে, রাতারাতি মিহিব দলের সামনের সারিতে এসে গিয়েছিল।

ভুল ভেঙেছিল অনেককাল বাদে। যখন আর ওর পক্ষে ফেরার মত কোন পথই খোলা ছিল না।

ইদানীং ক্বচিৎ মিহিরের সঙ্গে দেখা হত রমেনের। প্রকাশ্য দিবালোকে বড়রাস্তায় আজকাল মিহিরকে বড় একটা দেখা যেত না। কেননা, মিহির ক্রমশই ওর শক্রর সংখ্যা বাড়িয়ে চলছিল।

মাসকয়েক আগেকার কথা। দুপুরের শিফটে ডিউটি। মনে পড়ে যায় রমেনের। ট্রেনের গণ্ডগোল চলছিল। তাই বাস রাস্তার দিকে আসছিল।

হঠাৎ এক গলির ভেতর থেকে মিহিরের গলার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল ঃ এই রমেন, রমেন—

রমেন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মিহির গলি থেকে বেরিয়ে এসে স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বলেছিল, একটা সিগারেট ছাড়্ তো।

মিহিরের দিকে তাকাতে পারছিল না রমেন। কি চেহারা হয়ে গেছে। হাড্ডিসার। দুচোখ গর্তে ঢুকে গেছে। রুক্ষ চুল। দেখলেই বোঝা যায়—অনেকদিন হল ও স্নান করে নি।

সিগারেট ধরিয়ে মিহির শুধিয়েছিল কোথায় চল্লি ?— রমেন সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল, ফ্যাকটরীতে—

মিহির বলেছিল, একটা কাজটাজ জোগাড় করে দে না। পার্টি-ফার্টি আর ভাল লাগছে না।—রমেন ব্যঙ্গের সুরে বলেছিল, তুই করবি কাজ! একথা শেষপর্যন্ত আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ?—মিহিরের কণ্ঠস্বরে আবেগ উথলে উঠেছিল, সত্যি বলছি রমেন। যে কোন কাজ। তবে এখানে নয়। দূরে কোথাও। আমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই রমেন।— বিশ্বাস কর্। রমেন সেদিন মিহিরের কথায় গুরুত্ব আরোপ করে নি। বলেছিল, আচ্ছা, দেখব। এখন চলিরে। দেরী হয়ে গেল।

কিছুদিন আগে ফের একবার মিহিরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে-ই শেষ দেখা। রাতের দিকে। সোনালিকে নিয়ে ইভিনিং শো সিনেমা দেখে ফিরছিল রমেন। সাইকেল রিক্সায় চেপে। মিহির দাঁড়িয়েছিল কালীবাড়ির কাছে। অন্ধকারে। মিহির ডাকতে রমেন রিক্সা থেকে নেমে পড়েছিল। সোনালিকে বলেছিল, তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি আসছি।

তারপর মিহিরের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়েছিল, অনেক দিন হল তোর দেখা নেই। কেমন আছিস বল্।

মিহির শুকনো হেসেছিল, বেঁচে আছি, এই পর্যন্ত বলতে পারিস। কথাগুলো রহস্যময় মনে হয়েছিল।

রমেন বলেছিল, তার মানে!

মিহির বলেছিল, মানেটা খুবই সহজ রমেন। একবার হাতে যখন পাইপগান আর বোমা ধরেছি তখন কি আর এপথ থেকে ফিরতে পারব ভাবছিস। কোন দিন শুনবি—আমি টেঁসে গেছি।

রমেন ধমকে উঠেছিল, তোর যত সব বাজে কথা।

মিহির ফের শুকনো হেসেছিল, বাজে কথা নয় রে। সত্যি বলছি। আর বেশিদিন বোধ হয় আমি নেই রে—

সেইদিন প্রথম রমেন মিহিরকে মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখেছিল।

ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে রমেন ভাবল। আসলে কেউ যেন তাকে ভাবাতে বাধ্য করিয়েছিল। মিহির কি তবে ওর মৃত্যুর সংকেত টের পেয়ে গিয়েছিল আগেভাগেই। যদি তাই হয় তাহলে তার একবার লাশটার কাছে যাওয়া উচিত। নিশ্চিতভাবে জানা কর্তব্য —লাশটা সত্যি সত্যি মিহিরের কি না।

এমন সময় বৃষ্টি নামল। জোরে বৃষ্টি নামতে সংকট থেকে রক্ষা পেল রমেন। ছাতা নেই সঙ্গে। এতটা পথ বৃষ্টিতে ভিজে লাশ দেখতে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং—

রমেন রাস্তা থেকে একটা সাইকেল রিক্সা ডেকে তাতে চেপে বসল। চলল বাড়ির দিকে। আর সারাটা পথ শুধু এই কামনাই করল—লাশটা যেন মিহিরের না হয়।

## তিন

ঘণ্টাখানেকের মত জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তবু, আকাশ পরিষ্কার হল না। এদিক সেদিকে চাপ চাপ মেঘ জমাট বেঁধে রইল।

অসময়-বর্ষণই বাদ সাধল। নইলে, ষ্টেশনের কাছেপিঠের ছোট ছোট জমায়েতগুলো আরো কিছুক্ষণ উত্তেজনা ছড়াবার সুযোগ পেত।

বৃষ্টি, যেন মৌচাকে ঢিল, কৌতূহলীদের ঝেটিয়ে ছত্রখান করে দিয়েছিল।

শুধু একজন ছিল আগাগোড়া অবিকার, ভাবলেশহীন। সে ওই নিহত মানুষটি।

আত্মরক্ষা জীবনের ধর্ম। মৃত্যু তার বিকল্প। মৃত তাই ছিল সে নিঃশঙ্ক। এবং একা। দুর্যোগপূর্ণ আকাশের নিচে।

একা, তবে নিরাশ্রয় নয়।

হৃদয়হীন মানুষেরা তাকে পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু প্রকৃতি যেহেতু পক্ষপাতহীনা, তাই নয়। বরং সেই মমতাময়ী মৃতব্যক্তিকে অসহায় বলেই নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়েছিল।

সেটা দৃষ্টিগোচর হল বৃষ্টি ধরে এলে। দেখা গেল—মেঘক্ষরিত শ্রাবণ নিহত মানুষটির দেহের কালিমা অনেকাংশে ধুয়েমুছে দিয়েছে। বৃষ্টিধৌত প্রাণহীন দেহটি, ক্ষণকালের জন্য হলেও, স্নাত-শুভ্র। তার শরীর থেকে মৃত্যুর পীতরঙ অপসৃত। কণ্ঠনালীর ওপরকার রক্তের ফুল ধুয়ে গেছে। ক্ষতস্থান উন্মুক্ত। কিন্তু, সেই উন্মুক্তি ভীতিপ্রদ নয়।

নিহত মানুষটির জলে ধোওয়া নিকোনো শরীর নতুন কিছু তথ্যের আভাস দেয়। যা এযাবৎ ধরা পড়েনি। যেমন, বাঁহাত চুঁইয়ে নেমে আসা রক্তের কালচে সর ধুয়ে যেতে একটা উল্কি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একাক্ষরা সেই উল্কি। লেখা—'মা'। স্বভাবতই বোঝা যায়, মৃতব্যক্তি মাতৃভক্ত ছিল। যে ভক্তির ঋণ সে মৃত্যুর পরেও বহন করে চলেছে। আর, ডানহাতের দোমড়ানো কব্জির ভেতর থেকে লালচে আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে। সেই আভার উৎস একখণ্ড ডিমালো পাথর। প্রবাল। বৃষ্টিধারাই দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছে পাথরটিকে। ওটি মধ্যমায় রূপোর আংটিতে বসানো। রক্তমোক্ষণকারী কূপিত মঙ্গলের প্রতিষেধক ওই প্রবালখণ্ড—মৃতের আঙুলে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত শোভা পাচ্ছিল।

এসব তথ্যের গুরুত্ব বেশি নেই। এগুলো মৃতব্যক্তির সনাক্ত-করণের সপক্ষে জোরালো উপকরণ হয়ে ওঠে না। বরং, বৃষ্টি থেমে গেলে মৃতের ব্যক্তিপরিচয় দুর্জ্ঞেয়তর হয়ে উঠল। তার কারণ একাধিক। সকাল থেকে ডাউন এবং আপ লাইনে অনেকগুলি ট্রেন চলাচল করেছে। সেইসব মাটি-কাঁপানো লৌহ-দৈত্যের ছোটাছুটিতে প্রকম্পিত মৃতদেহটি আরো বাঁয়ে হেলে কাৎ হয়ে পড়ায়—লাশের মুখমণ্ডল একরকম দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে বললেই হয়। তারওপর, ঝোড়ো হাওয়া দূর-দূরান্ত থেকে খড়কুটো এনে মৃতের মাথার দিকটাকে ঢেকে দিয়েছে। ফলত, সনাক্তকরণের প্রধান উপায়টি লুপ্তপ্রায়।

বৃষ্টির পর মৃতের কাছে গুটিকয় জেদী রেলবস্তীর বাচ্চকাচ্চা ছাড়া আর বড় একটা কাউকে দেখা গেল না। প্রাতঃভ্রমণবিলাসীর দল অনেক আগেই কেটে পড়েছিল। এছাড়া দু'পাঁচজন ভদ্দরলোক ছোটলোক যাও বা ওখানে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় কথা চালা-চালি করছিল, তারা বৃষ্টি নামতে নিজ নিজ আস্তানায় ফিরে গিয়েছিল। বৃষ্টি থামতে তারা আর এল না। এল না একাধিক কারণে। প্রথমত, তাদের উত্তেজনার নিরসন ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত, 'পুলিশ আসছে' এ সংবাদ শুনে ফিরে আসা সঙ্গত মনে করে নি। তৃতীয়ত, বৃষ্টির পর বেলা বাড়তে তারা বৈষয়িক কৃত্যাদি সম্পাদনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এমন কি, প্ল্যাটফরমের ওপরেও নতুন কোন

জমায়েত গড়ে উঠল না। ভবঘুরে অকর্মা বেকার অবসরভোগীদের কৌতূহল বেশিক্ষণ তেজী থাকে না। হত্যা-সংবাদের উত্তেজনা এবং আকর্ষণ, বলতে গেলে, বৃষ্টির পর থিতিয়ে গেল।

অবশ্য বঙ্কিম সরখেল ফিরে এলে হয়ত ফের একটা জটলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। কিন্তু, তিনি পুলিশকে খবর দিয়ে সেই যে ঘরে গিয়ে বসে রইলেন—আর উঠলেন না। বরং, ফোন করে পুলিশকে খবরটা দেবার জন্য আত্মগ্লানিতে দগ্ধাতে লাগলেন।

তবু, অকুস্থলের কাছাকাছি দু'চারজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। তারা সাধারণ কৌতূহলীদের দলে পড়ে না। এমন সংকোচে সন্ত্রাসে তারা লাশের কাছাকাছি এসেই সরে যাচ্ছিল —যাতে বেশ বোঝা গেল তারা মৃতের ব্যক্তিপরিচয় জানতে সবিশেষ আগ্রহী। তবে এই লুকোচুরি খেলা ফলপ্রসূ হল না। অর্থাৎ, মৃতের সনাক্তকরণ আরব্ধ রইল। যদি সনাক্তকরণের কাজ সুনিশ্চিত হত তাহলে নিশ্চয়ই নতুন করে সোরগোল বেধে যেত।

টিকিটঘরে বসে বড়বাবু গজরাচ্ছিলেন, কি ঝামেলার মধ্যে পড়লাম রে বাবা। খুন করবার আর জায়গা পেল না—

টিকিট কালেক্টর কাউণ্টার থেকে বলে উঠল, আপনি বাড়ি চলে যান না বড়বাবু। পুলিশ এলে না হয় আমিই ফেস করব।—বড়বাবু খেঁকিয়ে উঠলেন, যা জানো না—তা নিয়ে বাজে ফ্যাচফ্যাচ করো না তো। তুমি কি ফেস করবে হে। ওরা ষ্টেটমেণ্ট চাইবে। সেই ষ্টেটমেণ্ট আমাকেই দিতে হবে, বুঝলে।—যে কাউণ্টারে বসে টিকিট দেয় সে বাইরে কোথায় গিয়েছিল। তাই টিকিট-কালেক্টর ছোকরা কাউণ্টারে বসেছিল। ধমক খেয়েও ছোকরা দমল না। বরং, ফের তোষামোদের ভঙ্গিতে বলল, কখন থানা থেকে ইনস্পেক্টার আসবে। এতক্ষণ বসে থাকবেন। বেলা তো কম হল না। এগারোটা বাজতে চলল। আপনি বরং বাড়ি গিয়ে স্নান-খাওয়া করুন। ওরা এলে না হয় আপনাকে ডেকে পাঠাব।—

বড়বাবুর সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল কালেক্টর ছোকরার ওপর। তিনি হাত নেড়ে বললেন, বেশ বললে! বাড়ি চলে গেলুম, —তারপর অসময়ে ডাক পড়ল। তখন, ভাতের থালা সামনে থাকলেও উঠে আসতে হবে।—কালেক্টর ছোকরা বোঝাতে চাইল, আপনি অসুস্থ। পুলিশ আজকাল যা ইরেসপন্‌সিবল্। কখন আসবে তার কি কোন্ ঠিক ঠিকানা আছে। কতক্ষণ ওদের আসার অপেক্ষায় আপনি হাঁ করে বসে থাকবেন?—হক্ কথা। বছরখানেক হল বড়বাবু ডায়াবেটিসে ভুগছেন। রোজ একটা করে ইনস্যুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হচ্ছে। একটু অনিয়ম হল কি শরীর বেচাল হয়ে পড়ল।

ছোকরার কথা শুনে বড়বাবু নরম হয়ে গেলেন। বড় করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন, সবে তো ঢুকেছ। কালে কালে সব টের পাবে। রেল-কোম্পানীর চাকরীতে কত মধুই না আছে। এখানে ডিউটি ঠিকমত না করলে মরবারও পারমিশান পাবে না, বুঝলে!

প্ল্যাটফরমের উত্তরে মেজদার দোকান তখন ভাঙা হাট। অফিসযাত্রীর দল সরে যেতে এসময় ওখানে নতুন এক প্রস্থ খদ্দেরের ভিড় জমে। এদের মধ্যে বেশির ভাগ হল—বেকার আড্ডাবাজ যুবকের দল। এক কাপ করে চা নেয়। সিগ্রেট ফোঁকে। আর রাজাউজীর মারে। এছাড়া ছুটছাট কিছু ধাপ্পা-বাজ লোকও এসে জোটে। রেসুড়ে, জমি-বাড়ির দালাল, ঘটক, হাফ-জ্যোতিষী, ফড়ে ইত্যাদিরা।

বিপদের গন্ধ পেয়ে যুবকের দল আজ আর আসে নি। তাতে মেজদা অখুশি নয়। যে মানুষটা বিচিত্র খদ্দেরের অজস্র অনুচিত হুজ্জুতি এবং অভিযোগ বিনয়ের সঙ্গে হজম করেও সকলের আপ্যায়নে তৎপর, সেই সদাহাস্যময় মেজদা খদ্দেরের অপ্রতুলতায় আদৌ বিমর্ষ নয়। বরং, দুচারজন আড্ডাবাজ এবং চাখোর নাছোড়বান্দা, যারা এসে জমবার চেষ্টা করছিল—তাদের হটাবার জন্য সরাসরি কিছু বলতে না পেরে মেজদা কর্ম্মচারীদের

ওপর জোর হম্বীতম্বী চালাল। কিরে নিবারণ, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস। কখন থেকে বলছি। কথা কানে যাচ্ছে না! বিস্কুটের বয়েমগুলো ঝটপট তুলে ফ্যাল। এই হারামজাদা পাঁচু। ফের উনুনে কয়লা দিলি। একি তোর বাপের দোকান। শিগ্‌গীরই আঁচ ফেলে দে। পই পই করে বলছি, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরব—

উক্তিটি বিলকুল মিথ্যে। মেজদা আসলে অন্য এক আশঙ্কায় দোকান বন্ধ করতে চাইছিল। এবং আশঙ্কাটা ভিত্তিহীন নয়। এই রেলওয়ে চায়ের ষ্টলটিতে শহরতলীর ভদ্রাভদ্র, মহদাশয় গুণ্ডা-বদমাস—সকল শ্রেণীর মানুষেরই সমাগম ঘটে। ফলে, সঙ্গত কারণেই পুলিশ এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উত্যক্ত করতে পারে। মেজদা শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাই তাকে দোকান বন্ধ করার ব্যাপারে এতটা তৎপর হতে দেখা গেল।

খুনের সংবাদ সকালের দিকে শহরতলীর সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে ঘটনার প্রতিক্রিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্তী এলাকায় যেভাবে দানা বেধে উঠেছিল দূরবর্তী অঞ্চলে সেটা ততটা গুরুত্ব পায় নি। যে কৌতূহল-আগ্রহ-উত্তেজনায় অকুস্থলের কাছাকাছি জায়গা থমথমে হয়ে উঠেছিল—দূরবর্তী এলাকাগুলিতে খুনের সংবাদ সে-জাতীয় আলোড়ন তোলেনি। সেসব জায়গায় নিহত মানুষটি কে, কারা হত্যাকারী, হত্যার কারণ কি, মৃত কিংবা হত্যাকারীর মধ্যে পরিচিত কেউ আছে কিনা—ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্ন আর জল্পনা শেষপর্যন্ত এক আধা রাজনৈতিক এবং আধা সামাজিক আলোচনার স্তরে উঠেছিল। তার বেশি নয়। তারপর, অর্থাৎ বৃষ্টি থামলে, সেই আলোচনাস্রোতেও ভাটা পড়ে গেল। শুধু, রেল-ষ্টেশনের কাছাকাছি কোথাও একটা খুন হয়েছে ঘটনাটি এই রকম একটা তথ্য হিসেবে শহরতলীর দূর এলাকার অধিবাসীদের চিন্তায় আর দশটা ভাবনার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণের জন্য জড়িয়ে রইল।

তবে, কোন কোন দূরবর্তী অঞ্চলে খুনের সংবাদ ছোট-খাট রসাল নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছিল।

যেমন, ষ্টেশন থেকে অনেক দূরে, বাসরাস্তার ওধারে বিরাট গভর্নমেণ্ট কনট্রাক্টর হরিহর মিত্রের পারিবারিক কলহের কথাই ধরা যাক না।

খেয়েদেয়ে জামাকাপড় পরে হরিহরবাবু দোতলা থেকে নামছিলেন। নিচে রাস্তায় তার গাড়ি দাঁড়িয়ে। একমাত্র সন্তান ছন্দা পাশের ঘর থেকে বইখাতা নিয়ে কাছে এসে বলল, চলো বাপি।

ছন্দা কলেজে পড়ে। প্রায়ই বাবার সঙ্গে এক গাড়িতে যায়। হরিহরবাবু মেয়েকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে অফিসে চলে যান।

হরিহরবাবু ভিতু সম্প্রদায়ের মানুষ। বললেন, আজ আর তোকে কলেজে যেতে হবে না।

বড়লোকের একমাত্র আদুরে মেয়ে। ছন্দা দুই ভ্রু জোড়া করে বলল, কেন বাপি?

হরিহরবাবু বললেন, এম্নি। একদিন না হয় কলেজে না-ই গেলি।

সুমিত্রা দেবী, হরিহর-পত্নী, কাছেই ছিলেন। তিনি বললেন, ক্ষতির কথা হচ্ছে না। মিছিমিছি কলেজ কামাই করবে কেন।

সুমিত্রাদেবীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেখে অবশ্য ততটা বয়স্কা মনে হয় না। সব সময় প্রসাধনে চর্চিত থাকেন। হাল-ফ্যাসানের শাড়ি ব্লাউজ পরেন। বয়স লুকোনোর প্রাণান্তকর চেষ্টায় উনি সদাব্যস্ত।

অগত্যা হরিহরবাবু নিজের মনোভাবটা ব্যক্ত করলেন, পাড়ায় একটা মার্ডার হয়েছে। একটা দিন না হয়—

সুমিত্রাদেবী খরতর গলায় বললেন, পাড়ায় কোথায়। সে তো কোথায় সেই ষ্টেশনের কাছে।

হরিহরবাবু এমনিতে সুমিত্রাদেবীর কথার ওপর কথা বলেন না। কিন্তু আজ মৃদু আপত্তি তুললেন, না মানে, পাড়ায় না হোক, একই লোকালিটির ভেতরে তো—

—এক লোকালিটি তাতে হয়েছেটা কি। কোথায় মার্ডার হল—অম্নি সবাই কাজকর্ম্ম বন্ধ করে ঘরে খিল এঁটে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না কি।—সুমিত্রাদেবী ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন।

—আমি কি সে-কথা বলেছি। ঘটনা যেখানেই ঘটে থাকুক না কেন—একটা টেনসন চলছে তো।

রাখো তোমার টেনসন। তুমি আসলে ভিতুর ডিম। এই ছন্দা, যা তো তুই ওর সঙ্গে। আমি বলছি।—সুমিত্রাদেবীর কণ্ঠস্বর চাষাড়ে হয়ে উঠল।

মনে মনে হাসছিল ছন্দা। হঠাৎ তার কলেজে যাওয়ার ব্যাপারে মার আগ্রহাতিশয্য লক্ষ করে। মেয়ের ব্যাপারে তিনি বরাবর উদাসীন। সময় কোথায় তার। নিজেকে নিয়েই সুমিত্রা-দেবী সবসময় উদ্‌ব্যস্ত। আসলে মেয়ের ব্যাপারে তিনি যে হঠাৎ স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছেন—এর কারণ অন্যবিধ। দুপুরের দিকে স্বামী এবং কন্যা বেরিয়ে গেলে মাঝেমধ্যে এ বাড়িতে এক ছোকরার আবিভাব ঘটে। সুমিত্রাদেবীর বিবৃতিমতে সে নাকি তার সম্পর্কিত এক মামাতো ভাই। ব্যাপারটা হরিহরবাবু কতটুকু বোঝেন—সেটা জানা না গেলেও, যেহেতু ছন্দাও মেয়েমানুষ, —তাই সে ঠিক আঁচ করতে পারে। মামাতো ভাইটাই সব বাজে কথা। আসলে সে ছোকরা সুমিত্রাদেবীর দ্বিপ্রহরিক প্রণয়সঙ্গী। আজ হয়ত তার আসার কথা আছে। সেই কারণেই সুমিত্রাদেবী মেয়েকে কলেজে পাঠাবার জন্য এতটা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

সব বুঝেও মার কথায় সুর মেলাল ছন্দা। বলল, আজকে আমাকে কলেজে যেতেই হবে বাপি। ফিলসফির প্রফেসর এস. এম. আজ আমাদের নোট দেবেন।—কথাটা ছন্দার মনগড়া। সে মার প্রতি অনুকম্পাবশত ওকথাটা মিথ্যা বলে নি। আসলে, ইদানীং ছন্দা অতনু নামে এক বয়ফ্রেণ্ড জুটিয়েছে। যার সঙ্গে আজ তার ম্যাটিনী শোয় সিনেমা দেখার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে।

হরিহরবাবু নিমরাজী হলেন। গজ্‌গজ করতে করতে সিঁড়ির দিকে এগুলেন। বললেন, ঠিক আছে, চল্‌। এ সংসারে যখন আমার কোন কথাই খাটে না—

অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এল। থানার ও. সি. আর সেই সঙ্গে জনাকয়েক কনেষ্টবল। বড়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে অনতিবিলম্বে ওরা অকুস্থলে গেল। ও. সি.-র ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল তিনি মোটেই খুশি নন। সাধারণত প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা না থাকলে পুলিশ সরেজমিনে কোন ব্যাপারে তদন্ত করতে আসে না। তার ওপর মার্ডার কেস। যত বাজে ঝামেলা।

লাশের কাছে এসে সব দেখে শুনে ও. সি. বেজায় খচে গেলেন। কর্কশ গলায় বললেন, এ কেস তো আমাদের জুরিস-ডিকশনে পড়ে না—

ও. সি.-র থমথমে চোখমুখ দেখেই বড়বাবু ঘাবড়ে গিয়ে-ছিলেন। তারপর তার বিরক্তিসূচক উক্তি শুনে তিনি আরো হতাশ হয়ে বললেন, কেন স্যর। ভাল করে লক্ষ করে দেখুন। ডেডবডির পায়ের দিকটা ডোবায় নেমে গেছে—

ও. সি. শুধোলেন, তাতে হয়েছেটা কি?

বড়বাবু মিনমিন করে বললেন, ডোবাটা তো রেলের জায়গা নয়—

ও. সি. হুংকার ছাড়লেন, আমাকে কি ছেলেমানুষ পেয়েছেন? হোক না ডোবা রেলওয়ে জমির বাইরে। কিন্তু, বলতে গেলে বডির প্রায় সবটাই তো আপনাদের জমির ভেতরে রয়েছে।

ও. সি.-র যুক্তি অকাট্য। তবু, বড়বাবু শেষ চেষ্টা করলেন, না, ঠিক সে কথা হচ্ছে না। ইনসিডেণ্টটা যখন রানওভার নয়—

ও. সি. আরো ক্ষেপে গেলেন, দেখে তো মনে হচ্ছে রেল কোম্পানীর চাকরী করে মশাই মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। আর এই আইনটুকু জানেন না। রানওভারের কেস হোক

চাই না হোক বডিটা যখন আপনাদের জায়গায় তখন কেসটা ট্যাকল্ করার দায়িত্ব অবশ্যই জি. আর. পি-র।

বেকায়দায় পড়ে বড়বাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, না, মানে, আমি ভেবেছিলাম—

—রাবিশ। আননেসেসারি আমাদের ডেকে এভাবে হ্যারাস করার কোন মানে হয়!

বড়বাবুও ভেতরে ভেতরে তেতে উঠেছিলেন। সরাসরি কিছু বলতে না পেরে দোষমুক্ত হতে চাইলেন, স্যর, আমি তো আপনাদের ডাকি নি। কাউন্সিলার বঙ্কিম সরখেল থানায় ফোন করেছিলেন।

সে-কথা শুনে ও. সি. তেলে-বেগুনে হয়ে উঠলেন, আচ্ছা! তাহলে বঙ্কিমবাবু ফোন করেছিলেন। তা, তিনি কোথায়?

পাকা অভিনেতার মত বড়বাবু বললেন, তিনি সেই সকালে একবার এসেছিলেন। তারপর তো তাকে আর দেখি নি—

ও. সি. ভেংচে উঠলেন, তাকে আবার দেখবেন কি। তিনি কি আর এপথ মাড়াবেন! ফোন করেই খালাস। এইসব ভেকধারী সোস্যাল ওয়ার্কাররাই হল ডেঞ্জারাস। মোষ্ট ডিষ্টাবিং এলিমেন্ট। কাজের নামে অষ্টরম্ভা। শুধু ট্রাবল্ ক্রিয়েট করার গোসাঁই—

মুখ কালো করে বড়বাবু অফিসঘরে ফিরে এলেন। কালেক্টর ছোকরা শুধোল, কি হল স্যর?

বড়বাবু রিসিভার থেকে ফোন তুলে নিতে নিতে বললেন, হবে আর কি। আমার শুষ্টির পিণ্ডি। কোথাকার কোন্ শালা মরে আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিয়ে গেছে।

বৃষ্টি শুরু হবার পর থেকেই বাজারের ওধারের সেই মাঠ-কোঠায় একটা ছোটখাটো মদের আসর বসে গিয়েছিল।

বৃষ্টির দিন। আবহাওয়া রং চড়ানোর পক্ষে অনুকূল। পটলা উদ্যোগী হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

ফিরে এল কয়েক বোতল দিশি মদ নিয়ে। সঙ্গে মুড়ির ঠোঙা। মুড়ি ছাড়া ঠোঙায় তেলে-ভাজা কাচালংকাও ছিল।

পটলা খুরিতে মদ ঢেলে বুম্বার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, ধরো ওস্তাদ।

বুম্বা বেঞ্চে বসে টেবিলে হেলান দিয়ে আয়স করছিল। সে বড় একটা হাই তুলে বলল, নাহ্, আমি খাব না। তোরা খা—

ঘোতন একটা বোতল কাছে টেনে নিয়ে বলল, সে কি, অমরিতে অরুচি। হল কি তোর?

বুম্বা জড়ানো গলায় বলল, কদিন ধরে মাইরি পেটের গণ্ডগোল চলছে—

ঘোতন খেঁজুর বীচির মত দুপাটি লালচে দাঁত বের করে হেসে উঠল, বলিস কি! পেটের গণ্ডগোল। ওসব তো ভদ্দরলোকদের হয়। কিছুটা গলায় ঢাল্, দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।

ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে এসেছে। হঠাৎ নিচে ভারী কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ শোনা যেতে বুম্বার চটকা কাটল। সে বলল, কি হল রে। কিসের শব্দ?

পটলা মুখে তেলে-ভাজা মুড়ি চালান করে দিতে দিতে বলল, ও কিছু নয়। নিচের দোকানে মাল নামানো হচ্ছে।

বুম্বা সে-কথায় আশ্বস্ত হল না। বলল ঘোতনকে, যা, একবার নিচে গিয়ে দেখে আয় তো,—কি হল।

বিরক্ত ঘোতন ঠোঁট থেকে মদের খুরি নামিয়ে বলল, তুই আজকাল সব ব্যাপারে এমন বমকে যাস যে—

বুম্বার শিরদাঁড়া টানটান হয়ে উঠল। টেবিল থেকে একটা বোতল টেনে নিয়ে রক্তবর্ণ চোখে বলল, চুপ কর্। বমকে যাবার কি হয়েছে। তোরা শালা কি বুঝবি। মেহন্নত করতে হচ্ছে না। মুফতে পকেটে পয়সা আসছে। মজা লুটে বেড়াচ্ছিস। একটা কিছু বেগোড়বাই হয়ে গেলে শেষে আমাকেই যে সব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়।

ওস্তাদের কথায় চুপ করে গেল ঘোতন। কি জানি কেন, কদিন ধরেই দলের সবাই লক্ষ করছে বৃস্বার মেজাজ-মর্জি ভাল নেই। হঠাৎ হঠাৎ রেগে উঠছে। তুচ্ছ ব্যাপারে বড্ড বেশী মাথা ঘামাচ্ছে।

বৃস্বা বোতল খুলে ঢকঢকিয়ে খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিয়ে বলল, বোস তোরা। আমি এক্ষুণি আসছি—

ঘোতন না বলে পারল না, কোথায় চললি আবার ?

বৃস্বা বলল, শালা লেটোটা সেই কখন গেছে—এখনো ফিরছে না। দেখে আসি একবার।

পটলা বলল, তোমার আবার যাবার কি হয়েছে। লেটো ঠিক ফিরে আসবে।

বৃস্বা পিচ কেটে বলল, তবু দেখে আসি। বিশ্বাস নেই শালাকে। শেষে একটা ঝামেলা বাধিয়ে ফেললে—

ঘোতনের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি উথলে উঠল, ঝামেলা বাধাবার কি আছে। আমরা তো আর খুনটুনের মধ্যে নেই।

বৃস্বা খেঁকিয়ে উঠল, তুই শালা মালখোর, কি বুঝবি। নেই— সেকথা পুলিশে শুনবে। কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে শেষটায় যদি লেটোটাকেই ধরে নিয়ে যায়—

পটলা বলল, চলো, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাই ওস্তাদ—

বৃস্বা বলল, না, খামাকা ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই। একটা সিগারেট দে তো—

ঘোতন বলল, একলা যাওয়াটা কি ঠিক হবে ?

বৃস্বা সিগ্রেট ধরাল। আত্মাভিমানে লাগল তার। বলল, কেন, একলা গেলে কি হবে। আমাকে কেউ গিলে ফেলবে নাকি।

পটলা বলল, সে কথা হচ্ছে না ওস্তাদ—

বৃস্বা কোন কথাই শুনল না। বলল, আমি এক্ষুণি আসছি—

বুম্বা নিচে যাবার সময় কাঠের সিঁড়িটা প্রবলভাবে কেঁপে উঠল।

পুলিশ চলে যাবার পর কোত্থেকে জটাপাগলা ছুটে এল। এতক্ষণ ওকে দেখা যায় নি।

ওর হাতে কয়েকখানা শুকনো রুটি। ডোবার দিকে গিয়ে লাশের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল.. কিরে, এখনো মরিস নি! নে, খা একটা রুটি।—এই বলে একটা রুটি ছুঁড়ে দিল মৃতব্যক্তির দিকে।

তারপর,—'সব শালাকে মরতে হবে। কেউ বাঁচবে না'—বলতে বলতে জটা পাগলা শিবমন্দিরের দিকে এগুল।

বর্ষণ শুরু হতে বুড়ি প্ল্যাটফরমের শেডের তলায় সরে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। বৃষ্টি থামতে আবার তাকে যথাস্থানে দেখা গেল। ওভারব্রীজের নিচে। শানবাঁধানো চৌকো বেদীর ওপর।

তার ডানহাত শূন্যে প্রসারিত। হাতে সেই চলটা-ওঠা এনামেলের বাটিটা অল্প অল্প কাঁপছিল। বুড়ির গলা থেকে স্বর বেরুচ্ছিল না। ছানিপড়া দুচোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এসেছিল। তার চিন্তা-ভাবনা সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

বুড়ী ডুকরে কেঁদে ওঠার ভঙ্গিতে বিড় বিড় করে বলে যাচ্ছিল আপনমনে: অমন সোনার চাঁদ ছেলে। কে মারল ওকে। তার প্রাণে কি দয়ামায়া নেই গো।

ডোবা থেকে কয়েক ঝাঁক জলজ পোকা উড়ে এসে মৃতব্যক্তির দেহের নানান জায়গায় চাঁক বেধে ঘুরছিল। ঘুরে ঘুরে যেন মানুষটাকে ফের জাগিয়ে তুলতে চাইছিল।

বেলা তখন এগারটার কিছু বেশি। শহরতলীর সবচেয়ে বড় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। ষ্টেশন আর বাসরাস্তা-এর মাঝামাঝি জায়গায়। হেডমাষ্টারের নির্দেশে ছেলেরা স্কুলবিল্ডিং-এর দোতলার হলঘরে জড়ো হয়েছে। অনতিবিলম্বে মাষ্টার মশাইরাও এলেন।

সদাব্যস্ত হেডমাষ্টার এলেন সবার পরে। পাটাতনের ওপরকার চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

কোলাহল শান্ত হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলে ঠেক দেওয়া তার ডানহাতটা ঠকঠক করে কাঁপছিল। ভদ্রলোকের বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে। তার মুখমণ্ডল থমথমে। চোখদুটো অসম্ভব ফোলা ফোলা। তিনি কাঁপাকাঁপা গলায় বলে উঠলেন, মাই ডিয়ার বয়েজ, ষ্টেশনের কাছে এক নৃশংস খুন হয়েছে। এর আগে এ অঞ্চলে এ জাতীয় খুন কখনো হয় নি। যে কোন মুহূর্তে পুলিশ এসে জোর তল্লাসী শুরু করে দেবে। দেশের পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। এ অবস্থায় আমি আজ স্কুল চালানো সঙ্গত বলে মনে করছি না—

হেডমাষ্টার মশাই কথা শেষ করতে পারলেন না। স্কুল ছুটি হয়ে যাচ্ছে—এ সংবাদে ছেলেদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি উঠল।

তখন অংকের টীচার ভবতারণবাবু উঠে দাঁড়ালেন সামনের বেঞ্চ থেকে। হাত তুলে বললেন, কি হচ্ছে। শান্ত হও তোমরা।

ভবতারণবাবুকে সব ছেলেই ভয় পায়। ওর বেতের বাড়িতে যে কি সুখ তা পরখ করে নি এমন একটি ছেলেও নেই এই স্কুলে।

গুঞ্জনধ্বনি মুহূর্তে নিভে গেল। ভবতারণবাবু বললেন, স্কুল-ছুটির ঘণ্টা পড়লে তোমরা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবে। গণ্ডগোল করবে না। আর হ্যাঁ, সোজা বাড়ি চলে যাবে। যদি শুনি, কেউ লাশের কাছে গিয়েছিলে। তাহলে কালকে কড়া শাস্তি দেব।

অধিকাংশ ছাত্রই ভবতারণবাবুর আদেশ শিরোধার্য করে বাড়ি চলে গেল। তবে, দু'চারজন যে দলছুট শিবমন্দিরের দিকে গেল না এমন নয়। তাদের মধ্যে হারাধন দত্ত রোডের সমীরও ছিল। ক্লাশ এইটের ছেলে। দুরন্ত এবং অবাধ্য।

সমীর বাড়ি ফিরতে দরজা খুলল ওর দিদি, শ্রাবণী। পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায় ঘরে বসে আছে।

শ্রাবণী শুধোল, কিরে সমু, ফিরে এলি যে?

সমীর বলল, ছুটি হয়ে গেল—

শ্রাবণী বলল, হঠাৎ ছুটি হল কেন, কি ব্যাপার?

বইখাতা টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সমীর বলল, একটা লোক খুন হয়েছে—তাই।

—খুন! সে কিরে! কোথায়?

—রেললাইনের পাশে। শিবমন্দিরের কাছে—

—তুই নিশ্চয়ই দেখতে গিয়েছিলি?

—গিয়েছিলাম। তাতে হয়েছেটা কি।—স্কুল ড্রেস খুলতে খুলতে সমীর বলল।

—কখন খুন হল?

—তার আমি কি জানি। সবাই বলল রাতের দিকে। কি ভয়ানক। গলাকাটা, মুখটা থ্যাতলানো। উফ্—।—জুতো খুলে ভেতরের ঘরের দিকে ছুটে গেল সমীর।

রেডিও খুলে বিবিধ ভারতীর গান শুনছিল শ্রাবণী। সমীর চলে যেতে ফের নব ঘুরিয়ে সাউণ্ড বাড়িয়ে দিল।

একটা বিশ্রি গান হচ্ছিল। গানের মাঝে হঠাৎ কার সমবেত চিৎকার।

শ্রাবণী ছুটে গিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল। আর সেই মুহূর্তে—একটা খুন, শিবমন্দিরের কাছে, রাতের দিকে :—

সমীরের দেওয়া খবরগুলো টুকরো টুকরো হয়ে তার চিন্তার ভেতরে ফুটে যেতে লাগল। এবং এই সূত্রে একটা দুর্ভাবনা

মনে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে শ্রাবণীর বুকের ভেতরে যেন বজ্রপাত হল।

খানিকক্ষণ সে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর প্রায় দৌড়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকল, সমু, এই সমু—

ভেতরের ঘর ছাড়ালে বারান্দা। বারান্দার একপাশে রান্নাঘর বাথরুম। সামনে উঠোন। উঠোনের পর খানিকটা জমি। তারপর বাড়ির সীমানা। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা।

সেই জমির এক জায়গায় সমীর দাঁড়িয়ে। সামনে কাঠের তৈরী কয়েকটা চৌখুপি। পায়রা পোষার শখ আছে সমীরের। সমীর ওখানে দাঁড়িয়ে পায়রাদের খাবার দিচ্ছিল।

শ্রাবণী বারান্দায় এসে দাঁড়াতে রান্নাঘর থেকে মা বললে, কিরে, চেঁচাচ্ছিস কেন?

মার মনমেজাজ দিনকয়েক হল ভাল নেই। বাচ্চা হবে বলে বড়বৌদি বাপের বাড়ি গেছে। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম এখন মাকেই করতে হয়।

শ্রাবণীরা তিনভাই একবোন। মেজদা বিয়ের পরেই আলাদা হয়ে গেছে। বাবা অনেকদিন হল রিটায়ার করে ঘরে বসে আছেন। মা মোটাসোটা মানুষ। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়।

শ্রাবণী বলল, সমুকে ডাকছি মা—

সমীর ততক্ষণ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। চেঁচিয়ে বলল, কিরে, ডাকছিস কেন দিদি?

শ্রাবণী হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে সমীরকে কাছে আসতে বলল।

—বল্ না কি বলবি।—সমীর বড় একরোখা।

ইচ্ছে থাকলেও গলা চড়িয়ে ওকে ডাকতে পারছিল না শ্রাবণী। রান্নাঘরের মুখে মা বসে। সকাল থেকেই শ্রাবণীর ওপর অপ্রসন্ন। কোন কাজ মেয়েকে দিয়ে হয় না, তাই।

শ্রাবণী তখন ভেতরে ভেতরে ফুটছে। কখন সমীরকে কাছে পাবে। কয়েকটা জরুরী প্রশ্ন আছে তার।

বেগতিক দেখে বারান্দা থেকে ফের ভেতরের ঘরে চলে এল সে। তারপর বড়দার ঘরে ঢুকল। ওঘর থেকে আর একটা দরজা দিয়ে উঠোনের ওধারে যাওয়া যায়। সেই পথ ধরল শ্রাবণী।

সমীরের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল এই সমু, একবার দোতলায় আসবি। একটা কথা আছে।

দোতলায় দুখানা ঘর। একখানায় বাবা থাকেন। আরেকটা মেজদার। মেজদা বাড়ি ছাড়ার পর শ্রাবণী ওটা দখল করেছে। পড়াশুনোর সুবিধার জন্য।

সমীর মাথা ঝাঁকাল এখন দোতলায় যেতে পারব না। যা বলবি এখানেই বল্—

শ্রাবণী বলল, এখানে না। প্লীজ, চল্ না।

সমীর ঝোপ বুঝে কোপ মারল, এখন আমার ওপরে যাওয়া চলবে না। পায়রাগুলোকে স্নান করাতে হবে।

শ্রাবণী বলল চাপা গলায়, গেলে তোকে একটা ভাল জিনিস দেব।

সমীর বলল, কি দিবি, আগে বল্।

শ্রাবণী হাসল, আচ্ছা ছেলেতো। ঠিক আছে,—এবার বিশ্বকর্মা পূজোর সময় ঘুড়ি কেনার জন্যে তোকে দুটো টাকা দেব না হয়। হলো তো!

সমীর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল, বিশ্বকর্মা পূজো! সে তো অনেক দেরী। তা হবে না। যা দেবার এক্ষুনি দিতে হবে।

শ্রাবণী অধৈর্য হয়ে উঠল, ঠিক আছে, আজকেই নাহয় দেব। এখন চল্ তো।

দোতলায় এসে তর সইছিল না শ্রাবণীর, তুই লাশটার কাছে গিয়েছিলি?

সমীর বলল, হ্যাঁ।

শ্রাবণী শুধোল, লোকটার বয়স কত হবে রে?

সমীর বলল, তা কি করে বলব। শরীরটা একসাইডে হেলে ছিল—

—তবু।

—তবু কি। তার ওপর থ্যাতলানো মুখ। দেখে বয়স বোঝা যায় না।

—কি রকম দেখতে রে?

—কি রকম আবার। লম্বা, ঢ্যাঙা, ফর্সা। একমাথা চুল—

শ্রাবণীর বুকে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ল।

—আর?

—আর কি?

—না, মানে, কি পড়েছিল লোকটা?

সমীর একটু ভাবল। তারপর বলল, গায়ে বুশ শার্ট। খয়েরী রঙের টেরিকটের প্যান্ট পরা। পায়ে হাওয়াই চটি—

এমন সময় নিচ থেকে মা ডেকে উঠল, শাবু কই গেলি? কখনো যদি কাছে পাওয়া যায় তোকে।

শাবু শ্রাবণীর অপভ্রংশ গার্হস্থ্য নাম।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শ্রাবণী বলল, আসছি মা।

সমীর বলল, এবার টাকা দুটো ছাড়্।

শ্রাবণী বলল, বাব্বা, এযে দেখছি কাবলীওয়ালা। এখন নয়, বিকেলে দেব, যা—

সমীর বলল, বিকেলে ফিকেলে নয়। এখনই দিতে হবে।

শ্রাবণী আলমারী খুলে টাকা বের করল। মেজদা থাকে শ্যামবাজারে। এখানে আসে মাঝে সাজে এলেই দুদশটা টাকা শ্রাবণীকে দেয়। শ্রাবণী আপত্তি করে। মেজদা ধমকায়ঃ নে বলছি। এখন কলেজে পড়ছিস। হাত খরচ তো কিছু লাগে।

ভারশূন্য শ্রাবণী একতলায় নেমে এল।

রান্নাঘরের কাছে আসতে মা বলল, হাড়ি থেকে মাগুর

মাছটা বের কর। বেলা হয়ে গেল। তোর বাবা এসেই তো ভাতের জন্য চেঁচাতে শুরু করবে।

শ্রাবণীর বাবা অম্বলের রুগী। ভাত সহযোগে কাঁচকলা দিয়ে আঝালি মশলাবিহীন জিওল মাছের ঝোল ওর প্রধান খাদ্য। পাশে চাটুজ্জ্যেদের বাড়িতে দাবাখেলার আসর বসে। সকালে উঠে স্নান আহ্নিক সেরে জলখাবার খেয়েই তিনি সেখানে চলে যান। বেলা বারোটা নাগাদ বাড়ি ফেরেন। শ্রাবণীর মা এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করে না। বুড়োমানুষ। কাজকর্ম কিছুই নেই। ঘরে থাকলে এটা সেটা নিয়ে ক্যাটক্যাট করেন। তাই, যতক্ষণ বাইরে আছেন—বাড়ি শান্ত থাকে।

জিওল মাছের হাড়িটা তাক থেকে নামাল শ্রাবণী। ঢাকনা খুলল। মস্ত একটা মাগুর মাছ। ঢাকনা খুলতেই খলবলিয়ে উঠে জল ছিটোতে লাগল মাছটা।

দৃষ্টি হাড়ির দিকে। কিন্তু শ্রাবণীর ভাবনায় অন্য ছায়া। লম্বা। ফর্সা। গায়ে বুশ শার্ট। একমাথা চুল। পরনে খয়েরী রঙের টেরিকটের প্যান্ট। পায়ে হাওয়াই চটি ·········

মাছটা হাড়ির ভেতর কেবলই পাক খাচ্ছে। শ্রাবণী ভেতরে হাত ঢোকাতে গেলে মা হা-হা করে উঠল, কি করছিস শাবু। জল না ফেলে মাছটা ধরবি নাকি। মাগুর মাছের শিং। ফুটে গেলে চিৎকার করে তো বাড়ি মাথায় তুলবি—

ধমক খেয়ে হাড়িটা নিয়ে বারান্দায় চলে এল শ্রাবণী। উঠানের ওধারে কলতলায় পায়রাদের স্নান করাচ্ছে সমীর। কাছাকাছি কোথাও রেডিও-তে চড়াসুরে ফিলমী গান বাজছে: তু, মেরিজান—

হাড়ির কাণা ধরে আস্তে করে জল ফেলতে লাগল শ্রাবণী। আকাশে মেঘ নেই এখন। ফের রৌদ্র উঠেছে। বৃষ্টি শেষের রৌদ্র। গাঢ়। সরষের তেলের মত রঙ। গভীর শূন্য মাথার ওপরে। 'শিল কাটাও'—গম্ভীর সুরে কাছাকাছি কোথাও কেউ হেঁকে

উঠতে শ্রাবণী চমকে উঠল। আঘাতে কাচ চিড়চিড় করে ফেটে গেলে যেমন হয় তেমনি একটা শব্দ বুকের মধ্যে কঁকিয়ে উঠল।

শ্রাবণী ভাবতে চাইল : রাতের দিকে খুন হয়েছে। শিব-মন্দিরের কাছে। শ্রাবণীর চিন্তার ভেতর যেন কেউ একটা বরফের চাঁই নামিয়ে দিল। কাল রাতে ওই পথ ধরেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিল সুহাসদা।

রাত তখন কটা। সওয়া নটা। সুহাসদা বলেছিল, তোমার ঘড়িতে কটা বাজল শাবু?

মণিবন্ধে চোখ রেখে বলেছিল শাবু, নটা পনের।

চিন্তিত সুহাসদা বলেছিল, তাহলে তো ট্রেন আসতে অনেক দেরী। আধঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে —

ওরা ডাউন প্ল্যাটফরমে শেডের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল।

শ্রাবণী বলেছিল, মোটে আধঘণ্টা! কথায় কথায় কেটে যাবে—

—তুমি এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?

—তাতে কি হয়েছে।—শ্রাবণী ওর সঙ্গ চাইছিল। অনেক দিন বাদে কাল এসেছিল সুহাসদা।

—বাড়ির লোক চিন্তা করবে না!

—চিন্তা করবে কেন। তোমার সঙ্গে তো বেরিয়েছি।

—তা হ'ক। ফিরবে তো একলা। আমি চলি—।—শুরু থেকেই সুহাসদা উশখুস করছিল। বলতে বলতে বারবার ওর কথা কেটে যাচ্ছিল।

শ্রাবণী বলেছিল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—কেন, বাড়িতে।

—বাসে যাবে?

পরের ষ্টেশনের কাছাকাছি থাকে সুহাসদারা। এক উদ্বাস্তু উপনিবেশে।

—না, বাসে যা ভিড়। তাছাড়া ষ্টপ থেকে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। তার চেয়ে লাইন ধরে সোজা চলে যাব।

—এই রাত্তির বেলা লাইন দিয়ে বাড়ি ফিরবে? তা হবে না।—শ্রাবণী জোরের সঙ্গে বলেছিল।

—কেন লাইনে সাপ বাঘ আছে না কি।

—সাপ-বাঘ না থাক। রেলকলোনীর দিকটা ভাল না। চোর জোচ্চরের আড্ডা—

সুহাসদা হেসে উঠেছিল, চোর জোচ্চর আমার কি করবে। ইস্কুল মাষ্টার আমি। আমাকে মেরে ফেললেও পাঁচটা টাকা পাবে না—

'স্কুল মাষ্টার'—এ পরিচয়টা আজকাল কথায় কথায় জানান দেয় সুহাসদা।

শ্রাবণী সহজে ভাঙতে চায় নি। বলেছিল, ঠিক আছে। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। তবে কথা দাও,—তুমি ট্রেনে যাবে—

—ট্রেনে? এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকব। ইমপসেবেল্।—সুহাসদা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

অভিমানে শ্রাবণীর দুচোখ টসটসে হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় এসে মাষ্টারী নেবার পর থেকে কেমন বদলে গেছে সুহাসদা।

একবছর আগেও যখন বর্ধমানে থাকত—ও তখনে অন্য রকম ছিল। শ্রাবণীর ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

—ইমপসেবেল না হাতি। আসলে তুমি আমার কথায় কোন গুরুত্ব দিতে চাও না, তাই—

কাল শ্রাবণীর অভিমানের কানাকড়ি মূল্য দেয়নি সুহাসদা। বরং, হাত নেড়ে এক কাহন বিরক্তিকর অজুহাত খাড়া করেছিল। বাড়িতে অস্তনস্ত একা আছে। বেশি রাত হলে ওরা চিন্তা করবে। আর তাছাড়া, একগাদা সেকেণ্ড টারমিনাল পরীক্ষার খাতা পড়ে আছে। লাষ্ট ডেট চলে গেছে। যত রাত্তিরই হোক আজ খাতাগুলো দেখে শেষ করতে হবে। নইলে কাল হেড-

মাষ্টারের কাছে বকুনি খেতে হবে। এখনো আমি আনকনফার্মড টীচার—

—তাহলে তুমি আমার কথা শুনবে না?—শ্রাবণী শেষ চেষ্টা করেছিল।

ফল হয় নি। ফের সুহাসদা হেসে উঠেছিল, মিছিমিছি তুমি ভয় পাচ্ছ শাবু। আমায় কেউ মারবে না—

জল ঢেলে হাড়ি নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে শ্রাবণী দেখল—মা উনুনের সামনে বসে। কড়াই-এর ফুটন্ত তেলে মশলা ফোঁড়ন দিয়ে ঘন ঘন খুন্তি নাড়ছে।

হাড়ি উপুড় করতে মাগুর মাছটা ডাঙায় পড়ে লাফ মেরে শ্রাবণীর দিকে এগিয়ে এল।তাই দেখে সে আর্তগলায় চেঁচিয়ে উঠল, মা—

ছ্যাক-ছেকে খুন্তী নাড়ার আওয়াজ বন্ধ হল। মা আঁচলের খুটে হাত-মুছতে মুছতে বলল, কি হল আবার।

মাছটা ততক্ষণে শ্রাবণীর পায়ের কাছে চলে এসেছে।

মা বলল, শিগগীরই বটিটা দিয়ে চেপে ধর্—

শ্রাবণী কাঁপছিল। বলল, তুমি এসো না।

মা এগিয়ে এসে বটিটা তুলে নিল, সর্।—তারপর বটির বাঁটটা বাগিয়ে অব্যর্থ নিশানায় মাছটার মাথায় কয়েকটা বাড়ি মারল। বার্কয়েক ছটফটিয়ে মাছটা নিঃসাড় হয়ে পড়ল।

মার হাত থেকে বটি নিল শ্রাবণী। পাতল। মাছের কান-কোর দুপাশ সন্তর্পণে ধরল।

মা ততক্ষণে ফের উনুনের কাছে চলে গেছে।

শ্রাবণী দম বন্ধ করে মাথা ছাড়িয়ে মাছটাকে বটির ফলায় বসিয়ে দিতে চিক্চিক্ করে একটা শব্দ হল। মাছটার ভেতরকার বাতাসটুকু বেরিয়ে গেল বোধ হয়। খানিকটা রক্ত ছিটকে পড়ল মেঝেয়।

মুণ্ডুহীন মাছটাকে নিচে নামিয়ে দিয়ে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল শ্রাবণী। তখনো তার কানের পর্দায় চিক্-

চিক্ শব্দটা বাজছিল। এবং সেই মুহূর্তে এই ভেবে শ্রাবণীর বুকের ভেতরটা পাক খেয়ে উঠল : লাশটা সুহাসদার নয়ত।

মুণ্ডুহীন মাছটাকে ফের হাতে তুলে নিল শ্রাবণী। সম্বরার ঝাঁঝালো গন্ধে তার ফুসফুস ছুটো কেঁপে উঠল। শ্রাবণীর ভাবনায় কাটাকুটি চলতে লাগল। সুহাসদার লাশ হলে কি সমীর চিনতে পারত না। কিন্তু. চিনবেই বা কি করে। থ্যাতলানো মুখ। মাথাটা একদিকে হেলে আছে। তবে, লম্বা ফর্সা পরণে বুশশার্ট খয়েরী রঙের টেরিকট—এসব দেখেও কি সমীরের মনে কোন প্রশ্ন জাগে নি! জাগার কথা নয়। সমীর একথা ভাবার সুযোগ পাবে কি সূত্রে যে মৃতব্যক্তি সুহাসদা হতে পারে।

মার চিৎকারে শ্রাবণীর চমক ভাঙল। বাবা কখন ফিরে এসেছেন। বারান্দায় গামছা কাঁধে দাঁড়িয়ে। কলতলার দিকে যাচ্ছিলেন।

মা ফের উঠে এল। বলল, একেবারে বেদিশা মেয়ে—

শ্রাবণী তখনো বুঝতে পারে নি। বলল, কেন, কি করেছি মা?

মা ধমকে উঠল. চোখের মাথাও খেয়েছিস। ইস্, কতটা কেটে গেছে—

শ্রাবণীর এবার.খেয়াল হল। তার ডানহাতের বুড়ো আঙুলের একটা জায়গা কেটে গেছে। চাপ চাপ রক্ত বেরুচ্ছিল।

মার চিৎকারে বাবা ছুটে এলেন। বললেন. দেখি—দেখি—

শ্রাবণী সলজ্জ বলল, কিছু নয় বাবা—

মা ধমকাল কিছু নয়! কোন কাজ যদি হয় তোকে দিয়ে। পরের ঘরে গিয়ে কি করবি মুখপুড়ি।

আজকাল 'পরের ঘর' কথাটা মা প্রায়ই শোনায় শ্রাবণীকে। এ আর কিছু নয়। শ্রাবণী যে.আর এ বাড়িতে বেশিদিন থাকবে না—এটাই প্রকারান্তরে জানান দেয় মা। মা আর বাবার মধ্যে অনেক ব্যাপারে মতের অমিল থাকলেও এব্যাপারে ওরা এককাট্টা। ওদের জ্ঞান-বিশ্বাস-অভিজ্ঞতামতে মেয়েদের যত তাড়াতাড়ি বিয়ে

হয়ে যায় ততই মঙ্গল। বাবা তো রীতিমত উঠে পড়ে লেগেছেন। খবরের কাগজে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি ছাড়ছেন। মাঝে মধ্যে বাড়িতে ঘটকের পায়ের ধূলো পড়ছে। বড়দা অবশ্য ওদের পক্ষে নেই। বলে: পার্ট টু পরীক্ষা দিয়ে নিক। তারপর যা ইচ্ছে করো। দিনকাল ভাল নয়। মেয়ে হলেও কিছু কোয়ালিফিকেশন থাকা দরকার। তাছাড়া, শাবুর বয়সটাই বা কি।

শ্রাবণীরও সেই মত। তবে তার চিন্তাধারা বড়দার চেয়ে ভিন্ন। সে সময় চায় সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

মা বলল, ওঠ্। অনেক হয়েছে।

শ্রাবণী উঠে দাঁড়াল। বাবা বললেন, আমার ঘরে চলে যা। ডেটল আছে। লাগা গিয়ে।

দোতলায় চলে এল শ্রাবণী। আলমারী খুলে ডেটলের শিশি বের করল। পায়রার ঝাঁক উঠোনে চলে এসেছে। ডানা ঝাপটে গা থেকে জল নামাচ্ছে কোনটা। কোনটা আবার ধারালো ঠোঁট দিয়ে মাটি থেকে পোকামাকড় তুলে নিচ্ছে।

ডেটল দিতেই কাটা জায়গাটা ব্যথায় কটকটিয়ে উঠল। তখনো রক্ত বেরুচ্ছিল। আরেক হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরতে একটা আরামদায়ক বেদনা অনুভব করল শ্রাবণী।

নিচে, কলতলা থেকে মগে করে জল নিয়ে উঠানের দিকে বাবা ছিটিয়ে দিচ্ছে। পায়রার দল পত পত শব্দে ডানা মেলে শূন্যে উঠে আসছে। দূরে কালীতলায় দ্বিপ্রহরিক পুজোর ঘণ্টা বাজছে। দূর আকাশে নীলের আভাস। সেদিকে চোখ পড়তে শ্রাবণীর খেয়াল হল—শ্রাবণ শেষ হলেই শরৎ আসবে।

একথা মনে হতেই সে যেন এক গভীর ঘুমে ডুব দিল। স্মৃতি ভেঙে কোথাও যেন নেমে যেতে লাগল। নীল আকাশ। আদিগন্ত সবুজের ঢেউ। শান্ত বনশ্রী। পাখির ডাক। পুজোর বাজনা। সোনা-রঙের শরতের উজ্জ্বল কিছু দিন। ভাবতেই ব্যথাটা

আঙুল থেকে বুকের মধ্যে উঠে এল। ভাবতে বসলে মনে হয় শ্রাবণীর সেসব দিন যেন এ জন্মের নয়।

সেবার পূজোর ছুটি পড়তে কাকামণি এলেন। কাকামণি তখন বি-ডি-ও। পোষ্টেড ছিলেন বর্ধমান শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এক গঞ্জ-মত জায়গায়।

এসে বললেন, চল্ শাবু। এবার পূজোর ছুটিটা আমার ওখানে কাটিয়ে আসবি।

বাবা বললেন, শাবু যাবে কি! স্কুল খুললেই যে ওর পরীক্ষা—

কাকামণি বাবার ওজর গায়ে মাখলেন না, পরীক্ষা তাতে হয়েছে কি। সকাল বিকেল না হয় আমিই দেখব।

সেদিন রাতেই বললেন কাকামণি, বই:খাতা সব গুছিয়ে ফ্যাল শাবু। কাল সকালের ট্রেনেই যাব কিন্তু।

কাকামণি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। বর্ধমান ষ্টেশনে জিপ এসেছিল। ওদের নিয়ে যেতে।

চোখে জল কাটল শ্রাবণীর। কুটোকাটা পড়লে যেমনটা হয়। কলকাতার প্রাণী। ইটকাঠ গাড়ি ঘোড়া মানুষজনের ভিড়ে মানুষ। সেই প্রথম গ্রাম দেখা। খোলা মাঠ গাছগাছালি সবুজ প্রান্তরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এবং সুহাসদার সঙ্গেও।

ভাবতে শ্রাবণীর এখনো সারা শরীরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে।

চোখ ডলল শ্রাবণী। জানালার ওধারে বৃষ্টিশেষের আকাশ। মস্ত, নিকোনো, শুনশান। গুঁড়ো গুঁড়ো নীল ছড়িয়ে আছে গভীর শূন্যে। যা শরতের আভাস আনে। মনে করিয়ে দেয় পূজোর ছুটির সেই দিন কুড়িবাইশের কথা! যা ভোলার নয়।

এমনি মাঝবেলায় ওরা গ্রামে পৌঁচেছিল। গ্রাম হলেও অজ পাড়াগাঁ নয়। বাঁধানো সড়ক। গ্রামের ধার ঘেঁষে ডি. ভি. সির খাল। এদিকে সেদিকে সাজানো গোছানো খামার বাড়ি।

কাকামণিদের দালানবাড়ি। পাকারাস্তার ধারেই। মস্ত জায়গা জুড়ে বাড়ি। উঁচু পাচিলে ঘেরা। সামনে দুটো ঘর। একটা বৈঠকখানা। আরেকটায় সুহাসদা থাকত। তারপর চওড়া বারান্দা। বারান্দার শেষে কাকামণিদের শোবার ঘর। তারই লাগোয়া ভাড়ার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম। বাঁধানো উঠোনে টিউবওয়েল। বাড়ির পেছনে অনেকটা বাগান জমি। এক পাশে গোরুর বাথান। তারে ঘেরা ছোটখাটো একটা পোলট্রি।

কাকামণি জিপ থেকেই হাঁক পেরেছিলেন, কই গো, দরজা খোলো। ছ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি।

সদর দরজা খুলেছিল বাড়ির মুনিষ সনাতন। পেছন পেছন কাকিমাও বেরিয়ে এসেছিলেন। শ্রাবণীকে দেখেই বলে উঠেছিলেন, ওমা শাবু, আয় আয়—

সনাতন এগিয়ে ট্র্যাভেলার্সটা শ্রাবণীর হাত থেকে তুলে নিয়েছিল।

শ্রাবণীর নেমে পড়তে জিপ গজরে উঠেছিল। কাকামণি চেঁচিয়ে বলেছিলেন, আমি একটু ব্লক অফিস থেকে ঘুরে আসছি।

ভোরে স্নান করেই বেরিয়েছিল শ্রাবণী। হাতমুখ ধুয়ে চটপট খেয়ে নিল সে। কাকিমা খান অনেক্ বেলা করে। নিঃসন্তান। কিন্তু তার কাজের শেষ নেই। গোয়াল ঘর ধোওয়া, মুরগীদের দানা-পানি দেওয়া, কাচাকুচি—সবদিক একাই সামলাতে হয় কাকিমাকে।

তিনি বললেন,—দৌড়ঝাঁপ করে এলি। জিরিয়ে নে একটু। আমার এখনো অনেক কাজ বাকি। বিকেলের দিকে তোকে নিয়ে বেরুব এখন—

বিছানায় কিছুক্ষণ গড়াগড়ি খেয়েছিল শ্রাবণী বৃথাই। ঘুম আসে নি। আসার কথা নয়। খোলা জায়গা। চারদিকে রোদ আলো। পাখির ডাক। থেকে থেকে মুরগীদের চিৎকার। অপরিচিত পরিবেশে যেমনটা হয়।

তখন বেলা দুটোর কাছাকাছি। কাকিমার চিৎকারে ধড়-মড়িয়ে উঠে বসেছিল শ্রাবণী।

কাকিমা কাকে যেন বলছিলেন, কোথায় গিয়েছিলি? বেলা কত হল খেয়াল আছে।

শ্রাবণী খাট থেকে নেমে পায়ে পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

সুহাসদা তখন উঠোনের রোদে দাঁড়িয়ে। ফর্সা। লম্বা। একহারা চেহারা। একমাথা কোঁকড়ানো চুল। চৌকো সরল মুখ। টলটলে চাহনি। খালি পা। পরনে হাফ প্যাণ্ট। সাটিনের জামা। হাতে একটা লম্বা বাঁশের লাঠি। লাঠির মাথায় একটা বাঁকানো গজাল লোহা। পায়ের গোড়ালিতে কাদা লেগে আছে।

সুহাসদা কাকিমার প্রশ্নটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না নিয়ে টিউব-ওয়েলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, বিলের দিকে গিয়েছিলাম।

কাকিমা চোখ কপালে তুলেছিলেন, বিলের দিকে! জানিস ওখানে কত বিষাক্ত সাপ আছে। তুই কি শেষকালে একটা বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়বি না।

—সাপ আছে তো কি হয়েছে। এই যে সাপ মারার অস্ত্র আছে—।—বলে সুহাসদা লাঠিটাকে বনবন করে শূন্যে বারকয়েক ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

তাই দেখে শ্রাবণী হাসি চাপতে পারে নি।

কাকিমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা বিলের দিকে কেন?

কচ্ছপ ধরতে।—মাথার ওপর বজ্রপাত হলেও অতটা চমকে যেত না শ্রাবণী। তার হাসির দমক দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল।

মুখ বিকৃত করেছিলেন কাকিমা, কচ্ছপ ধরতে। গেঁয়ো ভূত কোথাকার! আসুক আজ তোর জামাইবাবু। সব বলব তাকে।

হাতের লাঠিটাকে ছুঁড়ে ফেলে গোড়ালি উঁচিয়ে উঠোনে টাঙানো তার থেকে গামছা টেনে নিতে নিতে সুহাসদা গর্জে উঠেছিল, বোলো।

সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সুহাসদা। কাকিমা শুধিয়েছিলেন, আবার কোথায় চল্লি?

সুহাসদা উত্তর করেছিল, পুকুরে।

কাকিমা বলেছিলেন, কেন, একদিন টিউবওয়েলের জলে চান করলে কি হয়। এই ভরদুপুরে পুকুরে যাবার দরকারটা কি?

সুহাসদা ততক্ষণে সদরের দরজার খিল খুলছিল। বলেছিল চেঁচিয়ে যাবার আগে, দরকার আছে। আজ পুকুরের জলে ডুবে মরব—তাই।

কাকিমা হেসে উঠেছিলেন, শুনলি তো শাবু। যতসব পাগল উড়ুনচণ্ডে নিয়ে আমার সংসার।

সেদিন বিকেলের দিকে কাকামণির এক কলিগ সস্ত্রীক বাড়িতে এসে হাজির। ফলে, কাকিমার সঙ্গে গ্রাম দেখার প্রোগ্রামটা বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

কাকামণি-কাকিমা অভ্যাগতদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। শ্রাবণী একা পড়ে গিয়েছিল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পেছন দিকে চলে গিয়েছিল। গিয়ে অবাক। দেখে—পেছনের জমির এক জায়গায় চমৎকার একটা ফুলের বাগান। চারদিকে কলাবতী রংকচু পাতাবাহার আর লিলির ঝাড়ের সীমানা। ভেতরে অজস্র ফুলের গাছ।

ভেতরে সুহাসদা। খুরপী হাতে। আগাছা নিড়োচ্ছে। বাগানে ঢুকতে একটা গেট। কঞ্চি দিয়ে তৈরি। তাতে কুঞ্জলতার ঝাড় লতিয়ে উঠেছে।

গেটের ভেতর দিয়ে বাগানে ঢুকে পড়েছিল শ্রাবণী। শুধিয়ে—ছিল, সুহাসদাকে এটা ফুলের বাগান বুঝি?

তার কথায় একবার মুখ তুলেছিল সুহাসদা। তারপর ফের খুরপী চালাতে চালাতে বলেছিল, কেন, অন্য কিছু বলে মনে হচ্ছে না কি ?

প্রথম আলাপেই আক্রমণ। কারণটা শ্রাবণী বুঝতে পেরেছিল অনেকবাদে। বলেছিল, না, মানে, তুমি তৈরি করেছ বুঝি ?

সুহাসদা সেকথার জবাব দেয় নি। প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিল, কলকাতা থেকে আসা হচ্ছে, তাই না ?

—হ্যাঁ, কেন। কলকাতার মেয়েদের গায়ে কোন ছাপমারা থাকে নাকি ?—শ্রাবণীও নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

—থাকে বৈকি।

—কি রকম ?

—কি রকম আবার। চোখা চোখা হয়। আর বড্ড কটকটি—

—আর তুমি বুঝি বোবা ?

সুহাসদা উঠে দাঁড়িয়েছিল। উত্তরে হেসেছিল, শুরুতেই ঝগড়া। ভাল কথা নয়। এসো, তোমাকে ফুলগাছগুলো দেখাই।

সেটাও ছিল সুহাসদার একটা চাল। তারপর চলেছিল কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পালা। এটা কি গাছ ? কামিনী। ওটা ? কাঞ্চন। কাঞ্চন, বাঃ, চমৎকার নাম তো। ওদিকেরটা ? অপরাজিতা, তার পরেরটা জাতি। জাতি, জন্মে নাম শুনিনি। শুনবে কোত্থেকে। এসব দেশি ফুলের গাছ ! তোমরা শহরের লোক।

আত্মাভিমানে লেগেছিল শ্রাবণীর, শহরের লোক তো কি হয়েছে। আমাদের বাড়িতে ফুল গাছ নেই—তাই জানি না।

সুহাসদা তখন মজা পেয়ে গেছে, বলো তো এটা কি ?

—এটা ? কিছু একটা হবে।

—খুব চালাক, না ! এটা লংকাজবা। কিচ্ছু জানো না।—সুহাসদা বলেছিল। শ্রাবণী নিজের অজ্ঞতা ঢাকবার চেষ্টা করেছিল, লংকাজবা। কি বিশ্রী নাম !

সুহাসদা একটা গাছ থেকে কয়েকটা সাদারঙের ফুল ছিঁড়ে শ্রাবণীর হাতে দিয়েছিল। নাকের কাছে নিয়ে বলেছিল—শ্রাবণী, বাঃ, ভারি সুন্দর গন্ধ তো। এটা বেল ফুল তাই না ?

সুহাসদা বলেছিল, তোমার মুণ্ডু। এটা গন্ধরাজ। গন্ধরাজ ফুল চেনো না।

—চিনি না তো চিনি না। তাতে হয়েছেটা কি।

—হবে আর কি। শোধবোধ হয়ে গেল। এই আর কি।—সুহাসদা মিটিমিটি হাসছিল।

—তার মানে ?

—মানেটা খুব সহজ। দুপুরবেলা আমাকে দেখে হেসেছিলে : তার শোধ নিলাম।

পূজোর ক'টা দিন হইচই করে কেটে গিয়েছিল। সুহাসদার কয়েকদিনের ভেতরেই ভাবসাব হয়ে গিয়েছিল। না হয়ে উপায় ছিল না বলেই। সুহাসদা যা ছেলে! ওর সামনে বেশি—ক্ষণ গোমড়ামুখো থাকে কার সাধ্যি—।

ভাবতে গিয়ে শ্রাবণীর বুকের ভেতরে বুড়বুড়ি কাটল। স্মৃতির অতল থেকে দু'একটা প্রসঙ্গ আস্তে আস্তে উঠে এসে তার চিন্তাকে বিষাদমলিন করে দিচ্ছিল।

দুটো চন্দনা পুষেছিল সুহাসদা। বাড়ির মুনিষ সনাতনদা কোথায় কোন জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে পাখি দুটো ধরে এনেছিল। খুব বাচ্চা তখন চন্দনা দুটো। অনেক মেহন্নত করে ওদের পোষ মানিয়েছিল সুহাসদা।

রোজ স্নান করাত। ছোলা কাঁচালংকা কলা এসব ছাড়াও স্বাদ পাল্টাবার জন্যে ওদের জন্য মাঠ থেকে ফড়িং ধরে আনত সুহাসদা। চমৎকার দেখতে ছিল পাখি দুটো। বেশ বড় সড়। ফিকে সবুজ রঙের ঠোঁট। চোখের তারা স্বচ্ছ, গভীর। তার চারপাশে গাঢ় নীলের বর্ডার। পাখনাগুলো চকচকে মসৃণ।

আর গলায় খয়েরী রঙের পোঁচ। যেন কেউ তুলির টানে এঁকে দিয়েছে।

পাখি দুটো থাকত সুহাসদার ঘরে। খাঁচায়। দিনভর থেকে থেকে অবিকল কাকিমার মত সুর করে ডাকত: সুহাস, ও সুহাস, কই গেলি।

প্রথম দিকটায় শ্রাবণীকে দেখলে ক্ষেপে যেত পাখিদুটো। কাছে এগুলেই ধারালো ঠোঁট খুলে হাঁ—হাঁ করে ছুটে আসত। বিশ্রি চেঁচাত।

শ্রাবণী বলত: কি পাখিরে বাবা। বদখত চেঁচায় খালি।

সুহাসদা আরো তাতিয়ে দিত শ্রাবণীকে: চেঁচাবে না! তুমি যে শহুরে চিড়িয়া। তোমাকে তাই ওরা সহ্য করতে পারে না।

শ্রাবণী বলত: আহা-হা। তোমার যত উদ্ভট কথা।

সেই পাখি দুটো কয়েকদিনের ভেতরেই শ্রাবণীরও পোষ মেনে গিয়েছিল। সেটা অবশ্য সুহাসদার গুণেই। কাছে গেলে নাচা-নাচি শুরু করে দিত। দাঁড়ে পাগেঁথে চরকির মত শূন্যে পাক খেত। পাখনা ফুলিয়ে ওম্ ছড়াত। মিহি করে শিস দিত। তারপর একদিন থেকে সুহাসদার মত গলা করে ডাকতে শুরু করল: শাবু, শাবু—

কাকিমা বকবক করতেন: যত সব নোংরা শখ। ঘরবাড়ি নোংরা করে। একদিন, দেখিস, আমি ওদের ছেড়ে দেব—

উত্তরে বলত সুহাসদা: তোমাকে দিতে হবে না। আমিই একদিন দেব উড়িয়ে।

সত্যি একদিন সুহাসদা চন্দনাদুটোকে উড়িয়ে দিয়েছিল। শ্রাবণী যেদিন কলকাতায় ফিরে আসে ঠিক তার আগের দিন।

পর পর দুদিন আশ্বিনে জলঝড় হয়েছিল। সেই থেকে হঠাৎ পাখিদুটো কেমন মনমরা হয়ে পড়েছিল। বাটির খাবার বাটিতেই

পড়ে থাকত। স্নান করার সময় চেঁচামেচি করত। সারাদিন দাঁড়ের ওপর ঝিম মেরে বসে থাকত! শিস দিত না। মুখের বোল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কখনো কখনো ধারালো ঠোঁট দিয়ে খাঁচার ডাঁটিঠোকরাত।

তাই দেখে শ্রাবণী বলেছিল, পাখি দুটো কেমন নেতিয়ে পড়েছেনা। মনে হচ্ছে—ওদের কোন অসুখ হয়েছে।

সুহাসদা তার কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল, দুর্, অসুখ করবে কেন। কোন কারণে মন খারাপ হয়েছে। আমাদের হয় না! তেম্নি—

অহেতুক মন খারাপ হবার মত বয়স কি তখন হয়েছিল তার। ভাবতে চাইল শ্রাবণী। না, তখনো হয়নি। হয়েছিল পরের বার।

যখন সে গ্রীষ্মের ছুটিতে ফের গিয়েছিল কাকামণির বাড়িতে।

সেদিন বেলা পড়ে এলে খাঁচাটা হাতে নিয়ে সুহাসদা এসে দাঁড়িয়েছিল কাকিমাদের ঘরের সামনে। তখন শ্রাবণী আর কাকিমা ভেতরে বসে সাপ লুডো খেলছিল। খেলাটা জমছিল না। শ্রাবণী বারবার সাপের মুখে পড়ে নেমে যাচ্ছিল নিচে।

সুহাসদা ডেকেছিল, শাবু, বাগানের দিকে যাবে নাকি।

শ্রাবণী খেলা ছেড়ে উঠে পড়েছিল, আর খেলতে ভাল লাগছে না কাকিমা।

বাইরে এসে প্রশ্ন করেছিল, খাঁচাটা নিয়ে চললে যে।

সুহাসদার চোখে রহস্য উপচে পড়েছিল। চলোই না।

বাগানের ভেতরে ঢুকে সুহাসদা খাঁচার দরজা খুলতেই শুধিয়েছিল শ্রাবণী, একি, কি করছ?

সুহাসদা উত্তর করেছিল, কদিন হল যা মনমরা হয়ে আছে। পাখি দুটো একটু ছেড়ে দেব ভাবছি।

শ্রাবণী বলেছিল, সে কি, ছেড়ে দেবে কি। ছেড়ে দিলে যে পালিয়ে যাবে।

সুহাসদা ততক্ষণে খোলা দরজার ভেতর হাত গলিয়ে দিয়েছে, দুর্, পালিয়ে যাবে কেন। পোষমানা পাখি—

চন্দনা দুটোকে বের করে এনেছিল সুহাসদা।

—পোষমানা হলে কি হবে। আসলে ত ওরা বনের পাখি।— শ্রাবণীর গলায় উদ্বেগ ঝরে পড়েছিল।

পাখি দুটোকে ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে সুহাসদা। একটা উড়ে গিয়ে বসেছিল ওর মাথার ওপর। আরেকটা কাঁধে।

—এখন আর ওরা বনের পাখি নেই। আমি ওদের ভাল বেসে ঘরের পাখি বানিয়ে ফেলেছি।—সুহাসদার কণ্ঠস্বরে আত্ম-বিশ্বাসের রেশ ছিল।

—তোমার ভালবাসাকে ওরা থোড়াই কেয়ার করে।

শরীর কাঁপিয়ে হেসেছিল সুহাসদা, তুমি শহুরে চিড়িয়া। তুমি এর মর্ম কি বুঝবে। ভালবাসি বলেই ওরা পালিয়ে যেতে পারবে না, বুঝলে।

চন্দনাদুটো ডানা ঝাপটে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিল। তারপর একসময় সুহাসদার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পত্‌পত্‌ শব্দে বাতাস কেটে বাগানের পূবদিকের আম গাছটায় গিয়ে বসেছিল।

সুহাসদা দুহাতে তালি বাজিয়ে ডেকেছিল ওদের, চন্দনা, চন্দনা—

পাখি দুটো ডালে বসে এ ওর ঠোঁট ঘসেছিল। তারপর ঘন ঘন পাখনা ফুলিয়ে নাড়িয়ে শরীরের জট ছাড়াচ্ছিল।

তারপর একসময় ডেকে উঠেছিল, সুহাস, ও সুহাস, কই গেলি।

ডাক শেষ করেই ওরা শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে ঘন সবুজের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পড়ে দেখা গেল—ওরা আমগাছের ওধারে ক্রমশ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে! তারপর একসময় দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল।

আর ফিরে আসে নি চন্দনা দুটো। সেদিন, চারদিক আঁধার হয়ে আসা পর্যন্ত, থেকে থেকে চিৎকার করে ডেকেছিল সুহাসদা, চন্দনা, চন্দনা—

আমগাছের মগডাল থেকে দিনের শেষ আলোটুকু হারিয়ে যেতে বলেছিল সুহাসদা, আক্ষেপের ভঙ্গীতে, পাখি দুটো আর ফিরে এল না শাবু?

আবছায়াতেও বুঝতে কষ্ট হয় নি শ্রাবণীর—সুহাসদার দুচোখ জলে ভরে গেছে।

সেদিন রাতে কয়েকবার শ্রাবণীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। আর প্রতিবারই তার মনে হয়েছিল—সুহাসদা এখনো ঘুমোয় নি। বিছানায় শুয়ে পাখি দুটোর কথা ভেবে ছটফট করছে।

আর সেকথা মনে হতে, শ্রাবণীর বুকের ভেতরটাও, কি এক বেদনায় মুচড়ে উঠছিল।

হয়ত ওই বেদনার, ওই দুঃখেরই আরেক নাম ভালবাসা।

—কইরে শাবু, স্নান করতে যাবি না। বেলা যে অনেক হয়ে গেল।—মার ডাকে ঘোর কাটল শ্রাবণীর। অনেকক্ষণ ডুবসাঁতারের পর ভেসে ওটার মত চারদিকে বোবা চোখ ফেলল শ্রাবণী।

একটা নাম না জানা পাখি কোথায় কুব্ কুব্ শব্দে ডাকছে।

যাই মা।—চটকা ভাঙতে সন্ত্রস্ত গলায় বলে উঠল শ্রাবণী।

নিচে নেমে তোয়ালে নিল। তারপর চলে এল বাথরুমে। রান্নাঘরের লাগোয়া বাথরুম।

বাথরুমের ভেতরে পর্যাপ্ত আলো নেই। বাইরে, জানালার শার্সির ওধারে, দেখল শ্রাবণী কি চড়া রোদ। উঠোনের এক-কোণে পেঁপে গাছের চঞ্চল ছায়ারা মাতামাতি করছে।

খোঁপা খুলে চুল আলগা করে দিল শ্রাবণী। তেল মাখল না। আজ আর তেল মাখতে ভাল লাগল না তার। দুহাতের আঙুল

দিয়ে চুলের জট ছাড়াতে লাগল। একবার সামনের আয়নায়টায় চোখ পাতল। লক্ষ করল —নিচের পাতা অসম্ভব ফোলা ফোলা। যেন এই মাত্র সে ঘুম থেকে উঠে এল।

ট্যাপ খুলে আঁজলা পেতে জল নিয়ে মুখে পুড়ল শ্রাবণী। কুলকুচো করতে বুকের কলকব্জা নড়েচড়ে উঠল যেন।

সেবারগ্রীষ্মের ছুটিতে কাকামণির বাড়িতে গিয়ে অনেকদিন থেকেছিল। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট বেরুতে অনেক দেরী। হাতে অঢেল সময়। সুহাসদা তখন কলেজে পড়ছে। কলেজ গ্রাম থেকে দশবারো মাইলের পথ। রোজ যাতায়াত সম্ভব নয় বলে সুহাসদা তখন হষ্টেলে থেকে পড়াশুনো করত।

সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে শ্রাবণীর। খালি গা। কাঁধে গামছা। মুখে নিমের কাঠি। শ্রাবণী ছিল রান্নাঘরে। কাকিমাকে জিনিসপত্র জোগাচ্ছিল। সুহাসদা এসে বলেছিল, তুমি সাঁতার জানো শাবু?

জবাব দিয়েছিল কাকিমা, সাঁতার, সাঁতার ও কোথেকে জানবে। শহরে কি এখানকার মত পুকুরখালবিল আছে?

মাষ্টারীচালে মাথা নেড়েছিল সুহাসদা, ঠিক ধরেছি। বাংলাদেশের মেয়ে, সাঁতার জানো না। তা তো হয় না।

চলো আজ তোমাকে সাঁতার শেখাব।

শ্রাবণী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠেছিল, সাঁতারটাতার শিখে কাজ নেই আমার।

কাকিমা প্রশ্ন করেছিল, কোন পুকুরে যাচ্ছিস তুই?

সুহাসদা বলেছিল, কেন মণ্ডলদের পুকুরে।

কাকিমা ছিল সুহাসদার দলে, মণ্ডলদের পুকুর ভাল। আব্রু আছে। বাঁধানো ঘাট। যা না শাবু—

শ্রাবণীর কণ্ঠস্বরে আর জোর রইল না, হোক ভাল পুকুর। আমি যাব না।

সুহাসদা এগিয়ে একটা হাত ধরে টেনে তুলেছিল শ্রাবণীকে, যাবে না মানে। আলবৎ যাবে। আজ আমি তোমাকে সাঁতার শিখিয়ে তবে ছাড়ব।

মুখে জল ছিটিয়ে ট্যাপ বন্ধ করল শ্রাবণী। হোয়াটনট থেকে সাবান টেনে নিয়ে ডলতে লাগল গালে।

দৃশ্যটা মনে পড়ে যাওয়ায় ফিক করে হেসে উঠল সে।

ওটা মণ্ডলদের খামার বাড়ির পুকুর। কয়েকটা ধানের মরাই আর একটা কুঁড়ে ঘর ছিল কামিনদের জন্য। পুকুরটা বেশ নিরিবিলি জায়গায়। চারদিক কলাগাছের জঙ্গলে ঘেরা। তখন কেউ ছিল না খামার বাড়িতে।

ঘাটটায় এসে সুহাসদা মুখ থেকে নিমের কাঠিটা খসিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, চলো নামি।

গাছের মত শক্ত দুপায়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্রাবণী বলেছিল, ওরে বাবা! কতবড় পুকুর। আমি কিছুতেই নামব না।

সুহাসদা চোখ পাকিয়ে উঠেছিল, নামবে না। ঠিক বলছ?

হ্যাঁ, ঠিক।—থমথমে মুখ করেছিল শ্রাবণী।

সুহাসদা তারপর নাটকের প্রথম দৃশ্য উন্মোচিত করেছিল তারপর। গামছাটা কসে কোমরে বেঁধে নিয়ে ঘাটের উঁচু পৈঠা থেকে ডাইভ মেরে পুকুরে পড়েছিল।

এক দুই তিন……। পর পর একশ গোণার পরেও সুহাসদাকে ভেসে উঠতে দেখা গেল না। পুকুরের ওপরে একটা হালকা মেঘ উড়ে এসে রৌদ্রের রঙকে মলিন করে দিল। কোথাও দূরে পানা-দামের ভেতরে একটা নাম-না-জানা পাখি কুব্‌কুব্‌ শব্দে ডেকে যাচ্ছিল। ঢেউ মরে গিয়ে পুকুরের জল থিতিয়ে এল। সুহাসদার ভেসে ওঠার লক্ষণ দেখা গেল না। উত্তেজনায়, ভয়ে শ্রাবণী

কাঁপছিল থরথর করে। তারপর একসময় সে কাতর কণ্ঠে ডেকে উঠেছিল, সুহাসদা, সুহাসদা—

তার নিস্ফল কণ্ঠস্বর পুকুরের জল ছুঁয়ে ওধারের কলাগাছের জঙ্গলের শব্দহীনতায় মিশে গিয়েছিল। শ্রাবণী অধীর হয়ে ছুটে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নিচে জলের কাছে নেমে এসেছিল। তার কণ্ঠস্বর বোবায় ধরা মানুষের মত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল, সুহাসদা, সুহাসদা—

সুহাসদা ঘাটের ওধারে। শ্রাবণীর দৃষ্টির বাইরে। মাথাটুকু তুলে অপেক্ষা করছে। ডালে চিড়িয়া পড়েছে দেখে টুপ করে নিঃশব্দে ডুব দিয়ে অব্যর্থ নিশানায় ঘাটের দিকে চলে এসে অতর্কিতে শ্রাবণীর একটা পা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরেছিল।

তারপর, যেমনটা হয়, টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে জলে পড়ে গিয়েছিল শ্রাবণী।

ভুস্ করে জেগে উঠে খিলখিল করে সুহাসদা হেসে উঠতে ব্যাপারটা বোধগম্য হয়েছিল শ্রাবণীর। সে চিৎকার করে বলে উঠেছিল, এই সুহাসদা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

কে কার কথা শোনে। তখন সে পুরোপুরি সুহাসদার কব্জায়। সুহাসদা তাকে টানতে টানতে গলাডুব জলে নিয়ে গিয়েছিল।

শাওয়ার খুলে দিল শ্রাবণী। ঝির ঝির করে জল নামল। সাবানের ফেনা ছিটকে কণা কণা আয়নার কাচে বসে গিয়ে তার প্রতিচ্ছবি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে এল।

গলাডুব জল। পায়ের নিচে শ্যাওলায় পেছল সিঁড়ির ধাপ। শ্রাবণী রীতীমত টলছিল। ভাবতে গিয়ে তার শরীর শিরশির করে উঠল।

সুহাসদা বলেছিল, ভয়ঃপাচ্ছ কেন। আমি তো আছি।

ওর ওপর আদৌ আস্থা ছিল না শ্রাবণীর। না—না—না, —সবেগে মাথা নাড়তে বেচাল হয়ে সুহাসদার গায়ে আছড়ে

পড়েছিল। প্রস্তুত ছিল না সুহাসদাও। শ্রাবণী প্রাণপণে ওকে আঁকড়ে ধরেছিল। অনেক চেষ্টা করেও সুহাসদা সামলাতে পারে নি। সিঁড়ির শেষ ধাপ। এক সময় পা হড়কে গভীর জলের দিকে চলে এসেছিল দুজনে।

তারপর কয়েকটা মুহূর্ত। শ্রাবণী তলিয়ে যাচ্ছে। সুহাসদা ডুব দিয়ে মাছের মত ওকে টেনে তুলতে চাইছে। শেষে ভেসে উঠতে সুহাসদা বলেছিল, আমার গলা ছেড়ে দাও শাবু। হাত ধরো—

ঘাট থেকে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল তারা।

সুহাসদা একহাতে জল কেটে এগোচ্ছিল। তখন শ্রাবণীর বিপর্যস্ত শরীর ওর দেহ লেপ্টে ছিল।

ওপরে উঠে সুহাসদা বলেছিল, আচ্ছা মেয়ে। ওভাবে জড়িয়ে ধরতে হয়। শেষে ডুবে গেলে—

ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছিল শ্রাবণী। মুখ ভেংচে বলেছিল, শেষে ডুবে গেলে! অসভ্য কোথাকার।

ব্লাউজের ষ্ট্র্যাপগুলো একে একে খুলে ফেলল শ্রাবণী। খসিয়ে নিল অন্তর্বাস। হাত বাড়িয়ে আয়নার কাচে বসে যাওয়া সাবানের কণাগুলো মুছল। নাকের ডগা, কানের লতি, চিবুক, চুলের নদীনালা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল নামছিল। আয়নার কাচে প্রতিফলিত আবক্ষ; শুভ্র, স্নাত। ঝকঝকে সাবান ঘসা মুখ। সারা শরীরে ঝিরঝিরিয়ে একটা আরামদায়ক সুখস্পর্শ আঁচড় কাটছে। মুহূর্তের জন্য বিভ্রম ঘটল শ্রাবণীর। সে নিজের বঙ্কিম ঠোঁট দাঁতে চেপে ফিক করে হেসে উঠল।

সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত। বিকেলের দিকে আকাশ ভেঙে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। শ্রাবণীর খাওয়া হয়ে গেছে। সুহাসদা বাড়িতে নেই। যাত্রা শুনতে কোথায় যেন গেছে। কাকিমা রান্নাঘরে। টুকিটাকি কাজ সারছেন। কাকামণি গেছেন তাসের আড্ডায়। রাত করে ফিরবেন।

ঘরে একা শ্রাবণী। ছটফট করছিল। সারা শরীরে একটা অস্বস্তি। মনেও। একবার জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূরে বৃষ্টিভেজা আমগাছের পাতায় জ্যোৎস্না চলকাচ্ছিল। ফুলের বাগান থেকে একটা তীব্র সুগন্ধ ছুটে আসছিল। একটা পাখি কোথাও ডাকছিল একটানা।

অস্বস্তিটা যে কি ধরনের বুঝে উঠতে পারছিল না শ্রাবণী। বিছানায় এসে সে খানিকক্ষণ গড়াগড়ি খেল। সময় শব্দহীনতা-যে কি দুঃসহ সেই প্রথম অনুভব করেছিল শ্রাবণী। বিছানা থেকে উঠে বাইরে সে এসেছিল একবার। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। কাকিমা তখন বৈঠকখানা ঘরে। কাকামণির জন্য বিছানা পাতছেন। একবার ভেবেছিল সে—কাকিমা ডাকবে। কিন্তু পরক্ষণে একটা অকারণ লজ্জা তাকে নিবৃত্ত করেছিল।

ঘরে ঢুকে সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। আয়নার দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল নিস্পন্দ। সে যেন নিজেকেই নিজে চিনতে পারছিল না। কেমন মায়াবী, বয়স্ক অন্যরকম মনে হয়েছিল নিজেকে।

সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শ্রাবণীর। চারিদিক নিঃঝুম। পাশে কাকিমা শুয়ে। গভীর সুখে।

জানালা দিয়ে একখণ্ড ধারালো জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল তার বুকের ওপর। অত্যন্ত নির্দয় ভাবে। সেই আলো, উফ্ কি অসহ্য, তার জ্বরতপ্ত শরীরের কোষে কোষে যেন বিষ ঢেলে দিচ্ছিল।

বাইরে তখন হঠাৎ জ্যোৎস্নার পর্দা ছিঁড়ে একটা পাখি ডেকে উঠেছিল। তার সারা দেহে একটা তীব্র সুখস্পর্শের মাতন চল-ছিল। শ্রাবণী উঠে বসতে চাইছিল। পারছিল না। তার মনে হয়েছিল, সেই গভীর নির্জন রাতে, অপার শব্দহীনতায়, যেন একটা চন্দনা ডেকে উঠল—সুহাস, ও সুহাস, কই গেলি।

পরদিন স্নান ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কাকিমা চোখ

মটকে কপট হেসে বলেছিলেন, মুখপুড়ি, এখন থেকে তুই আর কচি খুকিটি নোস। তুই এখন রীতিমত লেডি, বুঝলি।

শ্রাবণীর শারীরিক অস্বস্তির কারণটা খোলসা করে সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কাকিমা। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটেছিল স্নানঘরে।

কয়েকদিন বাদে কলকাতায় চলে এসেছিল শ্রাবণী। সেদিন সকালবেলা। সুহাসদার সব আঘাতের চূড়ান্ত শোধ নিয়েছিল সে।

ঘরে বসে সুহাসদা পড়ছিল। চেয়ারে বসে।

ভেতরে ঢুকে বলেছিল শ্রাবণী, কি করছ?

বই থেকে মুখ তুলেছিল সুহাসদা, দেখতেই তো পাচ্ছ।

শ্রাবণী কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল, আজকেই চলে যাচ্ছি কলকাতায়—

— কখন?—সুহাসদার প্রশ্নে উদ্বেগের লেশমাত্র ছিল না।

—দুপুরের ট্রেনে।

—ওহ্।—বলেই টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

সংবাদটা সুহাসদার কাছে গুরুত্ব না পাওয়ায় রেগে গিয়েছিল শ্রাবণী। সে ঝুঁকে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিতে গেলে খপ করে হাত ধরে ফেলেছিল সুহাসদা।

ধরা পড়ে গিয়ে হেসে ফেলেছিল শ্রাবণী, হঠাৎ দেখছি তোমার খুব পড়ার ঘটা। ব্যাপারটা কি।

সুহাসদা বলেছিল, কলেজ খোলার সময় হয়ে এল। একদম পড়াশুনো হয়নি।

—তা হবে কেন। সারাদিন বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে। গেঁয়ো ভূত কোথাকার—

—আমি গেঁয়োভূত?—সুহাসদা মুখিয়ে উঠেছিল।

—গেঁয়ো ভূতই তো। হাত ছাড়ো বলছি।

—ছাড়ব না।

—ছাড়বে না?

—না।

এই দৃশ্যে নাটক ক্লাইম্যাক্সে উঠেছিল। প্রস্তুত ছিল না সুহাসদা। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঝুঁকে ওর ঠোঁটে একটা চুমু এঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বলেছিল শ্রাবণী, বোকচন্দর। কিছুই জানো না তুমি।

দরজার ওধার থেকে মা ডাকল, কিরে শাব্, এখনো স্নান হল না। তোর টেলিফোন এসেছে—

কাপড় পাল্টে ঘরে এসে রিসিভার তুলল শ্রাবণী, কে ?

—আমি মল্লিকা। কোথায় ছিলি। কখন থেকে ফোন ধরে বসে আছি।—মল্লিকা শ্রাবণীর কলেজের সহপাঠিনী।

—স্নানে গিয়েছিলাম। তারপর, খবর কি বল্।—মাথা ঝাঁকিয়ে চুল থেকে জল নামাতে চাইল শ্রাবণী।

—খবর ! খবর তো তোর।—কৌতুক করল মল্লিকা।

—মানে ?

—মানে ! তোর পেটে পেটে এত ছিল—

—কি বলছিস যাতা।

—আমি যাতা বলছি ! সর্বনাশটি করে এখন ন্যাকা সাজা হচ্ছে।—মারমুখী মল্লিকার কণ্ঠস্বর।

—সর্বনাশ ! কার ?

—কার আবার। দাদার। রাতদিন এখন ও তোকেই জপছে।—মল্লিকা যেন বোমা ফাটাল।

মল্লিকার দাদা অনিন্দ্য। চার্টাড এ্যাকাউণ্টেন্সীপাশ করে কোন এক মার্চেণ্ট অফিসে সবে মোটা মাইনের চাকরীতে ঢুকেছে।

—কি ফাজলামো করছিস।—শেষের দিকে শ্রাবণীর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল।

—ফাজলামো। কাল কোথায় গিয়েছিলি তুই।

ধর্মতলায়। মেজদার অফিসে। ওর নামে একটা চিঠি এসেছিল। সেটা দিতে— —ধরা পড়ে গিয়ে অকপটে বিশদ করে বলল শ্রাবণী।

—তারপর ?—দেখতে না পেলেও টের পেল শ্রাবণী—মল্লিকা মিটিমিটি হাসছে।

—তারপর, মানে, অনিন্দ্যবাবুর সঙ্গে দেখা।

—উনি গাড়ি থামিয়ে তোকে লিফ্‌ট্‌ দিলেন। বলে যা— —মল্লিকা বল্লে।

—হ্যা, তাই।

—সোজা তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিল ? না মাঝখানে কোথাও গাড়ি থামিয়ে—

শ্রাবণী বুঝল—এরপরের ব্যাপারটুকু অনিন্দ্য খুলে বলে নি মল্লিকাকে। সে বলল, হ্যাঁ, বাড়িতেই। বিশ্বাস কর—

—তোকে বিশ্বাস করলেও দাদাকে নয়। ওতো ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয়।

কাল আচমকা দেখা অনিন্দ্যর সঙ্গে। বিকেল বেলা। লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে।

গাড়ি থামিয়ে জোরে হর্ণ বাজিয়ে চমকে দিয়েছিল শ্রাবণীকে। শ্রাবণী চোখ ফেরাতে বলেছিল, এই যে শ্রাবণী, কোথায় যাচ্ছেন ?

অনিন্দ্যর ষ্টিয়ারিং-এ একটা হাত। চোখে রঙ চশমা। ক্রিমে বসে যাওয়া চকচকে একমাথা কালো চুল। গায়ে তরমুজ রঙের বুশশার্ট একটা। সাদার ওপর মেরুন রঙের ষ্ট্রাইপ—নেকটাইটা কণ্ঠনালীর ঠিক নিচে গেঁথে আছে। সরু গোঁফ। তামাটে ঠোঁটের ফাঁকে আধপোড়া সিগারেট।

অনিন্দ্যকে ভারি স্মার্ট দেখাচ্ছিল।

আরে আপনি !—এম্নি একটা কিছু না বললে নয় বলেই শ্রাবণী বলেছিল।

ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিল অনিন্দ্য, ভেতরে আসুন। বাড়ি ফিরবেন তো?

—না—না। আমি বাসে যাব।—মৃদুস্বরে ক্ষীয়মান কণ্ঠে উত্তর করেছিল শ্রাবণী।

—অফ কোর্স পারবেন। বাট টুডে আই মাষ্ট অ্যাভেল দ্য অপারচুনিটি অফ গিভিং ইউ এ লিফট্।—অকাতরে বলেছিল অনিন্দ্য।

মাঝপথে ওরা নেমেছিল পার্ক ষ্ট্রীটে। অনিন্দ্য বলেছিল, একবার গলা ভিজিয়ে নিলে হত না। আজ সারাটা দিন জব্বর খাটুনি গেছে।

শ্রাবণী নিয়েছিল কফি। আর অনিন্দ্য গ্রীন টি। ওর প্রিয় পানীয়। সঙ্গে কিছু স্ন্যাকস। অনিন্দ্য অবশ্য পীড়াপীড়ি করেছিল। আরো রিচ কিছু খাবারের অর্ডার দিতে চেয়েছিল। শ্রাবণী রাজি হয় নি।

ফিরবার পথে বলেছিল অনিন্দ্য, আবার একটা পিকনিক-টিকনিক করুন না। বড্ড বোর ফিল করছি।

শ্রাবণী নড়েচড়ে বসেছিল, মল্লিকাকে বলুন। ও এসব ব্যাপারে ওস্তাদ। আমার আপত্তি নেই।

শ্রাবণীর কথায় প্রশ্রয় পেয়ে গিয়েছিল অনিন্দ্য, ঠিক আছে, আমিই অ্যারেঞ্জ করছি। আমাদের অফিসের একটা আউট হাউস আছে। বজবজের কাছে। ভেরি ডিসেন্ট স্পট। একেবারে গঙ্গার ওপরে।

শ্রাবণী নিরুত্তর থেকেছে। হেসেছে মনে মনে। সে জানে—অনিন্দ্য তাকে দেখলে আজকাল মাত্রাতিরিক্ত সপ্রতিভ হয়ে ওঠে।

গাড়ি শ্রাবণীদের বাড়ির গলির মুখে এসে দাঁড়াতে প্রশ্ন করেছিল অনিন্দ্য, ছুটির দিনে হলে আপনার আপত্তি নেই তো। আই মীন রোববার—

দরজা খুলে মাটিতে এক পা রেখে বলেছিল শ্রাবণী, যতদিন রেজাল্ট না বেরুচ্ছে ততদিন প্রত্যেকদিনই আমার কাছে রবিবার—

আই সি। তাহলে তো আর কথাই নেই—। অনিন্দ্য বলেছিল।

শ্রাবণী নেমে পড়ে বলেছিল, আসুন না একবার আমাদের বাড়িতে। ফের এক কাপ চা খেয়ে না হয় যাবেন। অবশ্য গ্রীন টী হবে না।

অনিন্দ্য দু'কাঁধ নাড়িয়ে শিশুর মত একদমক হেসে গাড়ির চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে বলেছিল, থ্যাঙ্কস। সো কাইণ্ড অফ ইউ। আজ নয়, আরেক দিন আসব। আজ এখনই একবার পাড়ার পেট্রল পাম্পে যেতে হবে। কদিন হল ইঞ্জিনের কিছু একটা গণ্ডগোল চলছে। কনস্ট্যাণ্ট একটা হামিং সাউণ্ড উঠছে।

গাড়ি স্টার্ট নিতে হাত নেড়ে বলেছিল শ্রাবণী, মনে থাকে যেন। এর পরের দিন কিন্তু আর ছাড়ছি না। আমাদের বাড়িতে—

আই প্রমিজ।—শ্রাবণীর কথা কেড়ে নিয়েছিল অনিন্দ্য।

এই শ্রাবণী কি হ'ল।—মল্লিকার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আওয়াজে শ্রাবণী নড়েচড়ে উঠল। চোখের সামনে দিয়ে ছবিটা খসে পড়ল যেন।

—ও, হ্যাঁ। কি বলছিলি যেন।—কথাগুলো গুছিয়ে বলতে সময় নিল সে।

—বলছিলাম তোর মুণ্ডু। এখন বল্ কবে মাকে নিয়ে তোদের বাড়িতে যাব।

—তার মানে?

—মানে, দাদার আর তর সইছে না যে। —খিল খিল করে হেসে উঠল মল্লিকা।

—ধ্যেৎ, কি সব আজেবাজে বকছিস।—চাপা ধমকের সুরে বলল শ্রাবণী।

—সত্যি রে ! কালকে বাড়ি ফিরেই, দাদাটা কি ঠোঁটকাটা, সরাসরি বলল মাকে।

চড়াৎ করে শ্রাবণীর শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে এল। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল, না মল্লিকা, এখন নয়—

—এখন নয় কেন। তোর বাবা তো তোর জন্যে পাত্র খুঁজছেন, সে কি আমি জানি না। আর আমার দাদা নিশ্চয়ই খুব খারাপ পাত্র হবে না !—মল্লিকার কণ্ঠস্বর ইষৎ ভারি হয়ে উঠল।

—বিশ্বাস কর মল্লিকা, আমি—, —কিছুক্ষণ আগে স্নানঘর থেকে এলেও ঘেমে নেয়ে উঠছিল শ্রাবণী।

কুলকুল করে হেসে উঠল মল্লিকা, ওঃ, তাই বল্, ঘাবড়ে যাচ্ছিস ! বড্ড নার্ভাস তুই।

—মল্লিকা, শোন্ শোন্— ।— মল্লিকা ততক্ষণে ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

চোখ তুলল শ্রাবণী। বাবা রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছেন। পাশের বাড়ির রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। বিবিধ ভারতীর প্রথম অধিবেশন শেষ হল। বাইরে চড়া রোদ। কে বলবে ঘণ্টাদেড়েক আগেও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল।

কাপড়ের আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল শ্রাবণী। অনিন্দ্য যে এমনি একটা কাণ্ড পাকিয়ে তুলবে—শ্রাবণী কিছুদিন ধরে সেই আশঙ্কাই করছিল।

বছরখানেক হল শ্রাবণী মনের দিক থেকে কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। ইউনিভারসিটির পড়া ছেড়ে সুহাসদা কলকাতার উপকণ্ঠে চলে আসার পর শ্রাবণীর চিন্তা-ভাবনার গতির পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। নইলে, কখনই সে অনিন্দ্যকে প্রশ্রয় দিত না।

আজ থেকে ঠিক এক বছর আগের কথা।

একদিন শ্রাবণী কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে দেখে সুহাসদা বাইরের ঘরে বসে মার সঙ্গে গল্প করছে। ওর দিকে চোখ পড়তেই শ্রাবণীর বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠেছিল। ওকে

চেনাই যাচ্ছিল না। চেহারায় অনেক ভাঙচুর হয়ে গেছে। রুক্ষ চুল। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঘোলাটে দৃষ্টি। আগের সেই সতেজ ভাবটা নেই।

শ্রাবণী শুধিয়েছিল, বর্ধমান থেকে কখন এলে?

মা উঠে যাবার আগে বলেছিল, বোসো সুহাস। আমি চা করে নিয়ে আসছি।

সুহাসদা মলিন হেসেছিল, বর্ধমান থেকে! সে তো অনেকদিন হল চলে এসেছি। তা মাসখানেক হবে।

তাই নাকি! হঠাৎ চলে এলে কেন?—মুখোমুখি সোফায় বসে পড়েছিল শ্রাবণী।

—তুমি কি কিছুই জানো না শাবু?

—কি জানব?

—আমার বাবা ফের বিয়ে করেছেন।—মাথা হেঁট করে কথা কটা আউড়েছিল সুহাসদা।

—বলো কি! আমরা তো কিছুই জানি না। এই তো মে মাসেও কাকামণি এসেছিলেন। কিছু বলেন নি তো!

—বলবার মত কথা নয় বলেই বলেন নি।—সুহাসদার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

—তুমি এখন আছো কোথায়?

—কলোনীর বাড়িতে। বাবা আমাদের আলাদা করে দিলেও বাড়ি ছাড়া করেন নি। একটা ঘরে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন।

—তাহলে, তোমার পড়াশুনো?—শ্রাবণী অধীর হয়ে উঠেছিল।

—পড়াশুনো!—ফের মলিন হেসেছিল সুহাসদা, ঘরে দুটি ছোট ভাইবোন। ওদের কে দেখবে?

—কেন, তোমার বাবা।

—বাবা! হাসালে। বুড়ো বয়সের বিয়ে। এরপর কি আর বাবার কাছে কিছু প্রত্যাশা করা যায়?

—তাহলে, এখন তুমি কি করছ ?

—কপালগুণে একটা জুনিয়ার হাইস্কুলে মাষ্টারী পেয়ে গেছি। তাই রক্ষে।

—মাষ্টারী !—অবাক কণ্ঠে বলেছিল শ্রাবণী।

—হ্যাঁ, মাষ্টারী। চমকে উঠলে মনে হচ্ছে ?

—না, মানে। আর কোন ভাল চাকরী—। কাকামণিকে বলেছিলে ?

—বলবার আগেই উনি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। ব্লক অফিসেই—

—সেটা নিলে না কেন ?

—ওর অনেক নুন খেয়েছি শাবু। একই অফিসে চাকরী, এ নিয়ে কথা উঠতে পারে। তাই আর ওকে বিব্রত করতে চাইনি—

সুহাসদাকে সেদিন একদম অন্যরকম মনে হয়েছিল শ্রাবণীর। অনেক বয়স্ক। ভিৎ নড়ে যাওয়া একটা মানুষ।

·

মা রান্নাঘর থেকে হাঁক পাড়লেন, কই-রে শাবু, এলি না ! আর কতক্ষণ তোর জন্যে ভাত নিয়ে বসে থাকব।

এলোচুলেই শ্রাবণী রান্নাঘরে চলে এল। বাবার তখন খাওয়া প্রায় শেষ। শ্রাবণীর খাওয়া হয়ে গেলে মা স্নানে যাবে। মার্ হাজারো বাতিক। সকলকে দিয়েথুয়ে তবে স্নান করে। তারপর ঠাকুরের সিংহাসনের জল পালটায়। ধূপধুনো দেয়। পূজোয় বসে। বেলা গেঁজে উঠলে তবে রান্নাঘরে খেতে ঢোকে।

ভাত ভাঙতে ভাঙতে শ্রাবণী বলে, সমু কোথায় গেল মা ?

কে জানে কোথায়। ও বাঁদরটার কথা আর আমাকে বলিস না।—মা ডাল ঢালে শ্রাবণীর পাতে।

বাবার খাওয়া শেষ। তিনি উঠে যাচ্ছেন। উনুনে এনামেলের হাড়িতে সেদ্ধ কাপড় টগবগ করে ফুটছে।

মা বলল, এই যে, মাছের ঝোলের বাটি রেখে গেলাম। আমি আসছি একটু। আচারের বয়েমটা উঠোনে পড়ে আছে। কুকুরটকুর এসে মুখ দিলে কেলেঙ্কারী—

মা চলে গেল। মাছের ঝোলের বাটি উপুড় করল শ্রাবণী। সব কিছু আজ তার বিস্বাদ লাগছে। লেবু চটকে সে খানিকটা রস মেখে নিল ভাতে।

শ্রাবণীর ভাবনার ভেতরে তখন একটা অপরাধবোধ খেলা করছিল। পাশাপাশি দুটি মুখ, দু'ধরনের পরিবেশ তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। পর্যায়ক্রমে। ছায়াছবির মত।

একটি মুখ সুহাসদার। ক্লিন্ন, ক্লান্ত, উদ্যমহীন, বিষণ্ণ সেই মুখচ্ছবি।

আরেকটি মুখ অনিন্দ্যর। প্রাণোচ্ছল, সম্ভ্রান্ত, নির্ভরযোগ্য, সদাহাস্যময় এক যুবকের।

অনিন্দ্যর বাড়ি। ছবিটা স্পষ্ট করে মনে ধরতে চেষ্টা করল শ্রাবণী। তেতলা। গোলাপী রঙের। গেট দিয়ে ঢুকতে বাঁয়ে মখমলের মত নরম ঘাসে ছাওয়া মস্ত লন। ডাইনে গ্যারেজ। মাঝখান দিয়ে লাল মোরেমের পথ। ঝাউ-এর সারি ছাড়িয়ে পথটা এগিয়ে গেছে বাড়ির দিকে। দোতলায় থাকে অনিন্দ্য। মেঝে বিচিত্র টাইল বসানো। তার ওপরে কিছুটা জায়গা জুড়ে কাশ্মীরি কার্পেট বিছানো। নীলচে আভার ডিসটেম্পার করা দেয়ালে একঝাঁক কাঠের তৈরী উড়ন্ত পাখি। পাশে মস্ত একটা চাইম ক্লক। কিছুক্ষণ পর পর টুংটাং শব্দে বেজে ওঠে। ঘরের একপাশে মেহগনি কাঠের খাট। মস্ত রংদার চাদরে ঢাকা। শিয়রের ওধারে ব্যালকনি। মুখ তুললেই মস্ত আকাশটা চোখের সামনে জেগে ওঠে। ঘরের আরেক কোণায় একটা টেবিল। পাশে ষ্ট্যাণ্ডের মাথায় রেশমী ঘেরাটোপ। সুইচ টিপে ঘরের আলো যেমন খুশি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কখনো সেই আলো উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত। কখনো বা হালকা সবুজ। দেয়ালে কাঠের

চৌখুপী। তার কোনটায় বই। কোনটায় রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিও। আরেক দিকে তেকোণা টেবিলের ওপর অ্যাকুরিয়াম। সেখানে লাল নীল হলুদ নানারঙের মাছেদের নিঃশব্দ চলাচল। •

আর সুহাসদা! ভাবতে চাইল শ্রাবণী। সুহাসদা কোথায় থাকে! সুহাসদার বাড়িতে কখনো যায় নি সে। তবু কল্পনায় সে একটা ছবি গড়ে তুলতে পারে। যে ছবিটা মোটেই দৃষ্টিসুখকর নয়।

সুহাসদা বলেঃ বেশ আছি শাবু। ভোরবেলা উঠি। বাজারে যাই। ফিরে এসে স্নান খাওয়া সারি। তারপর ইস্কুলে যাই। স্কুল ছুটির পর শুরু হয় টিউশনি। রাত করে বাড়ি ফিরি টলতে টলতে। স্বপ্নের ভেতরেও পড়াই ছেলেদের। অঙ্ক বাংলা ভূগোল। সময় আমাকে একমুহূর্তের জন্যও রেহাই দেয় না শাবু।

অনিন্দ্য বলেঃ বুঝলেন, লাইফটা হচ্ছে ফুল অফ থ্রিল। ইট ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড বী মেরী। সব সময় টপ স্পীডে চলতে চাই আমি।

দরজার মুখে ছায়া। মা দাঁড়িয়ে। বলল, কিরে শাবু, কিছুই তো খেলি না। ভাতের মনে ভাত পড়ে আছে—

গ্লাসের জল পাতে ঢেলে দিয়ে শ্রাবণী বলল, খেতে ইচ্ছে করছে না মা।

মা ধমকে উঠল, আজ তোর কি হয়েছে বল্ তো। কি ভাবছিস এত।

শ্রাবণী হাসতে চাইল, কিচ্ছু না মা। এম্নি —

তারপর উঠে ও দ্রুত মার পাশ কাটিয়ে বারান্দায় চলে এল।

সময় যেন পাগলা ঘোড়ার খুরের মত শ্রাবণীর বুকটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল। কোনরকমে আঁচিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে ডাকল সে, সমু, সমু—

সমীরকে এই মুহূর্তে কাছে পাওয়া দরকার শ্রাবণীর। সে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চায় ওকে।

প্রশ্নগুলো এইরকম : লাশটার কাছে গিয়েছিলি সমু ? ভাল করে দেখেছিলি। চোনাশোনা কেউ বলে মনে হয় নি তো। মানে আমাদের সুহাসদা নয়ত—

মা রান্নাঘর থেকে বলে উঠল, কিরে শাবু, চেঁচাচ্ছিস কেন ?

শ্রাবণী থরথরিয়ে কাঁপছিল। সে বলল হাঁপধরা গলায়, সমুকে খুঁজছি মা। ও যে কোথায় গেল—

মা বলল, দ্যাখ তো বাইরের ঘরে আছে কিনা।

বারান্দা থেকে মার ঘর। মার ঘর ছাড়ালেই বাইরের ঘর। অথচ, এই সামান্য পথটুকু পার হতে পারছিল না শ্রাবণী। সুহাসদার মলিন বিষণ্ণ মুখখানা যেন বারবার তার পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছিল।

কাল অনিন্দ্যর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার বেশ কিছুক্ষণ পর বাড়িতে সুহাসদা এসেছিল। শ্রাবণীর মনে আছে রেডিওতে তখন স্থানীয় সংবাদ হচ্ছে। বাবা বাড়িতে ছিলেন না। সমীর বাবার ঘরে পড়ছিল। মা রান্না সেরে বাথরুমে গিয়ে গা ধুচ্ছিল।

শ্রাবণী দরজা খুলেছিল। ভেতরে ঢুকেই বলেছিল সুহাসদা, হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে যেতে দু-দুটো টিউশনি কামাই করে চলে এলাম শাবু।

সুহাসদার দিকে তাকাতে শিউরে উঠেছিল শ্রাবণী : উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আরো রোগা লাগছিল ওকে। উস্কখুস্ক চুল। মুখে হতাশার ভাব।

শ্রাবণী বলেছিল, আচ্ছা পাগল তো। বোসো।

সুহাসদা সোফায় বসে পড়ে বলেছিল, একগ্লাস জল খাওয়াবে ?

শ্রাবণী বলেছিল, জল খাবে কেন। যা গরম পড়েছে। সরবৎ করে আনি ?

সুহাসদা সবেগে মাথা নেড়েছিল, না—না, জল হলেই চলবে।

জল নিয়ে এসে শ্রাবণী বলেছিল, প্রাইভেটে এম-এ পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল সুহাসদা। কত কাল আর স্কুলে ঘসটাবে।

এক চুমুকে গ্লাস শূন্য করে বলেছিল সুহাসদা, এম-এ পরীক্ষা! প্রাইভেটে! সংসার সামলাবে কে। এ জন্মে আর পরীক্ষাফরীক্ষা দেওয়া হবে না।

শ্রাবণী উষ্ণ হয়ে উঠেছিল, আহা-হা। সবসময় তোমার যত বাজে কথা। ঘর-সংসার করে আজকাল কত লোকে পরীক্ষা দিচ্ছে—

সবার সঙ্গে আমাকে এক করে দেখো না শাবু।—উত্তেজিত গলায় বলেছিল সুহাসদা।

কেন, তুমি কি সৃষ্টিছাড়া না কি।—শ্রাবণী সমান জোরের সঙ্গে বলেছিল।

সে তুমি বুঝবে না শাবু।—সুহাসদা নড়েচড়ে উঠেছিল।

মার তখন গা ধোওয়া হয়ে গেছে। পাশের ঘরে কাপড় ছাড়ছিল। শুধিয়েছিল, কে রে শাবু?

সুহাসদা।—বলে শ্রাবণী সুহাসদার কথার খেই ধরেছিল, বুঝব না! আসলে তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ। একেবারে বদলে গেছ সুহাসদা—

বদলে গেছি? আমি! হা-হা-হা।—অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুহাসদা।

একি, উঠলে যে! আর একটু বোসো না।— শ্রাবণী বলেছিল।

না, আজ আর নয়। বাড়িতে কাজ আছে। আরেক দিন আসব।—সুহাসদা উসখুশ করছিল।

চলো, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।—শ্রাবণীর কেনই যেন মনে হয়েছিল সুহাসদা প্রকৃতিস্থ নেই।

যাবে? আচ্ছা চলো।—একটা হাই তুলেছিল সুহাসদা।

শ্রাবণী চেঁচিয়ে বলেছিল, আমি একটু বেরুচ্ছি মা। সুহাসদার সঙ্গে। এক্ষুণি আসছি।

মা আপত্তি করবে না শ্রাবণী জানত। সুহাসদাকে মা খুব পছন্দ করে।

বসবার ঘরে এসেও সমীরকে পেল না শ্রাবণী। সে গলির দিকে জানালার কাছে এগিয়ে গেল। বাইরে চোখ ফেলল। না, সমীরকে দেখা যাচ্ছে না।

পায়রাগুলো ছাদের কার্নিশে উড়ে বসেছে। বকবকম শব্দে একটানা ডেকে চলেছে। বুকের মধ্যে যেন একটা পাথরের চাঁই বসে যাচ্ছে শ্রাবণীর। তাহলে সুহাসদা কি বুঝতে পেরেছিল। হয়ত তাই। নইলে কাল তার কথাটা কেন অদ্ভুতভাবে হেসে ফিরিয়ে দিয়েছিল। শ্রাবণী ভাবতে চাইল। সত্যি, কে বদলে গেছে। সে না সুহাসদা!

পায়রাগুলো অবিরাম ডেকে যাচ্ছে। পায়রা, শহরের চিড়িয়া। শ্রাবণীর সারা শরীর কেঁপে উঠল। শ্রাবণীর চোখের সমুখ দিয়ে যেন একজোড়া চন্দনা দ্রুত উড়ে যাচ্ছিল কোথাও।

দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল শ্রাবণীর। সে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। তার সমস্ত শরীর একটা পলকা গাছের মত কাঁপছিল। সে দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকল। এবং ভাবতে চাইল ফের: তবে কি সে মনে মনে চাইছিল--সুহাসদা তার জীবন থেকে সরে যাক।

না—না—না।—বলে উঠল শ্রাবণী। তারপর যতক্ষণ পারল কাঁদল সে। নীরবে।

বেলা প্রায় একটা। আকাশ মেঘশূন্য। বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণের এখন ভিন্নমূর্তি। মাথার ওপরে অগ্নিশ্রাবী সূর্য। মাটি জলীয় তাপ ছাড়ছে। বড় অকরুণ মধ্যাদিন। খোলা আকাশের নিচে মৃতদেহ। একই ভঙ্গিতে পড়ে আছে।

এখন ওখানে কেউ নেই। না অবাধ্য ছেলের দল। না জটা-পাগলা। সময় ওদের ক্লান্ত নিরুৎসাহিত করে অকুস্থল থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এমন কি জলজ পোকারাও নেই। তারা নিহত মানুষটিকে জাগিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করে অনেকক্ষণ আগেই ডোবার দিকে ফিরে গেছে।

হাওয়া বৃষ্টি রৌদ্রের পর্যায়ক্রমিক আক্রমণে, এখন মৃতদেহের সর্বাঙ্গে পচনের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তাই, লাশটা একেবারে সহায়হীন হয়। জলজ পোকাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে এক দঙ্গল নীল মাছি।

হত্যাকাণ্ডের কাছে মানুষজন না থাকলেও আশপাশের অধিবাসীরা কিন্তু মৃতদেহের উপস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ।

এদিক থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমপরিবর্তন রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক।

ভোরের দিকে, মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হবার অব্যবহিত পরে, এরা যারপরনাই উত্তেজিত ছিল। খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, তখন নিহত মানুষটি কে হতে পারে—মৃতদেহের সনাক্তকরণ বিষয়ক প্রশ্নটিই ছিল তাদের কাছে মুখ্য।

দ্বিতীয় স্তরে, বেলা নটার পর, সর্বজনপ্রিয় স্থানীয় কাউন্সিলার বঙ্কিম সরখেলের চকিত আবির্ভাব এবং আকস্মিক অন্তর্ধানের পর, থানা—পুলিশ—অনুসন্ধান—জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদি সম্ভাব্য হুজ্জুতির আশঙ্কায় এরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর, মুষলধারে

বর্ষণ শুরু হওয়া থেকে বৃষ্টি ধরে যাবারও বেশ কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার তৃতীয় স্তরে, এরা অংশত প্রাকৃতিক এবং অংশত বৈষয়িক কারণে মৃতদেহের কথা ভুলে ছিল।

সর্বশেষে, রৌদ্র ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে, এখনও, উদ্ধারকারীর দল না আসায় পচনশীল মৃতদেহের অবাঞ্ছিত অস্তিত্ব এদের অস্বস্তি এবং বিরক্তির কারণ হয়ে উঠল।

রেল লাইনের পূবদিকে, শিবমন্দির এবং রেল-প্ল্যাটফরমের মাঝামাঝি জায়গায়, এক প্রাসাদোপম বাড়ির তেতলার হেঁসেল ঘরে বসে প্রবীণ এ্যাডভোকেট বরদাবাবুর গিন্নী ইলিশমাছ ভাজছিলেন। আজ বাড়িতে অনেককালবাদে মেয়ে জামাই এসেছে। তাদের আপ্যায়নের জন্য বরদাবাবু বাজার থেকে এক জোড়া ইলিশমাছ কিনে এনেছিলেন। ইলিশমাছ ভাজা সহযোগে খিচুরি—জামাইর প্রিয় খাদ্য। স্নানপর্ব সমাধা করে পাশের ঘরে জামাতাসহ বরদাবাবু খাবারের অপেক্ষায় বসে আছেন। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, গরম অসহ্য হয়ে উঠেছে—ইত্যাকার কারণে থেকে থেকে বরদাবাবু বাজখাই গলায় হাঁক পাড়ছিলেন, কি হলো! আর কত দেরী!—বাড়িতে রান্নার ঠাকুর আছে। কিন্তু জামাই আসায় বরদাগিন্নী আজ ঠাকুরের রান্নায় আস্থাশীলা না হয়ে নিজেই রাঁধতে এসেছেন। সুপ্রচুর চর্বিযুক্ত মোটা থলথলে তার দেহ, তার ওপরে বাতের রোগী। ডিমের বড়া, পটলের দোরমা, আলুর দম, ভাজাভুজি, খিচুরি ইত্যাদি রান্না হয়ে গেছে। এখন চলছে লাষ্ট আইটেম। ইলিশমাছ ভাজা হচ্ছে। কিন্তু, ভাজতে বসে বারবার বরদাগিন্নীর মনোযোগ নষ্ট হচ্ছিল। তেতলার ঘর। জানালা দিয়ে মৃতদেহটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কড়াই এ ইলিশমাছ, অদূরে মড়া—বরদাগিন্নী বিব্রত বোধ করছিলেন। তিনি মৃতদেহের উদ্দেশ্যে শাপশাপান্ত করছিলেন। বলছিলেনঃ যতসব অনাছিষ্টি কাণ্ড! পইপঁই করে বলেছিলাম—রেললাইনের ধারে জমি কিনো না। তা শুনল আমার কথা! এখন যত রাজ্যের মড়া ছ্যাখো বসে

বসে। ওয়াক থু —। —বরদাগিন্নী বমি তোলার ভঙ্গিতে সিঁটিয়ে উঠলেন। সম্মুখস্থঃগঙ্গার টাটকা ইলিশের গন্ধের চেয়েও দূরবর্তী পচে ওঠা মৃতদেহের দুর্গন্ধ তাকে যেন বেশি উত্যক্ত করছিল।

ওদিকে পাশের ঘরে জামাই বরদাবাবুকে নিরস্ত করতে ব্যস্ত। সে বলছিল: এত হাঁকাহাঁকির কি হয়েছে। বেলা তো মোটে একটা। ছুটির দিনে বাড়িতে আমি দুটোর আগে ভাত খাই না। —উক্তিটি নির্জলা মিথ্যা। কিন্তু আজ, এই বাড়ির কাছাকাছি কোথাও একটা মড়া পড়ে আছে শুনে, তার ক্ষুধাতৃষ্ণা সব উবে গিয়েছিল।

বরদাবাবুর পাশের বাড়িটা শম্ভু চক্রবর্তীর। তিনি কর্তী অধ্যাপক। গ্রন্থকীট ব্যক্তি। আজ অফ ডে। তাই কলেজে যান নি। বৈঠকখানার ঘরে বসে গিবন সাহেবের লেখা রোম সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতন বিষয়ক মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থখানি পড়ছিলেন। স্ত্রী সুদেষ্ণা দেবী। রান্না সেরে স্নান করে ঘরে এসে হাল্কা প্রসাধনের পর বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তার হাতে একটা বাংলা সিনেমার পত্রিকা। সকাল থেকে শম্ভু চক্রবর্তী সুদেষ্ণা দেবীকে জ্বালাচ্ছেন। থেকে থেকে হাঁকডাক করছিলেন। কই এক গ্লাস জল দেবে। ডেডবডি কি এখনো পড়ে আছে। কফি হবে না কি এক কাপ। একটা বেবালগন ট্যাবলেট দিয়ে যাও তো। পেটটা ব্যথা ব্যথা করছে। উফ্, কি গরম! ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে যাও না। ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে শম্ভু চক্রবর্তী গ্রন্থে কিছুতেই আজ মনঃসংযোগ করতে পারছিলেন না।

হঠাৎ তিনি 'রাবিশ' বলে বিকট চিৎকার করে উঠে বইটা মেঝেয় ছুঁড়ে দিলেন।

আবার কি হল!—বলে পাশের ঘরের বিছানা থেকে উঠে শাড়ি সামলাতে সামলাতে সুদেষ্ণা দেবী বৈঠকখানার ঘরে ছুটে এলেন।

শম্ভু চক্রবর্তী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ভুঁড়ি নাচাতে নাচাতে বললেন, কি আবার হবে। হিস্ট্রি সাবজেক্টটা চুস করাই হয়েছে আমার জীবনের সবচেয়ে ভুল।

কেন, কেন।—সুদেষ্ণা দেবী স্বামীর কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না।

হিস্ট্রি মানেই রেকর্ডস অফ টরচার, মার্ডার, ক্রাইম, মাস অ্যানিহিলেশন অ্যাণ্ড, অ্যাণ্ড ·· ···।—নিজের বক্তব্য শেষ করতে পারলেন না শম্ভু চক্রবর্তী। থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি প্রেসারের রোগী। একবার মাইল্ড হার্ট এ্যাটাক হয়ে গেছে। উত্তেজিত হয়ে পড়লে সমূহ বিপদ।

সুদেষ্ণাদেবী সামাল দেবার জন্য তাকে দুহাতে ধরে বলতে চাইলেন, তাতে তোমার কি। তুমি তো ঘরে বসে আছ।—সবটা বলা হল না। চোখের সামনে রেললাইনের ধারের মৃতদেহেব ছবিটা ফুটে উঠল। তখন তিনিও শম্ভু চক্রবর্তীকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে শুরু করলেন।

রেল লাইনেব লাগোয়া পশ্চিমদিকে একটা বাড়ির একতলার ঘর। সেখানে তিনতাসেব খেলার আসর বসেছে। খেলা চলছে অনেকক্ষণ ধরে।

হঠাৎ হীরু তালুকদার হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, দুর, আর খেলব না। বাড়ি চলি।

হীরু তালুকদার পাকা খেলুড়ে। অথচ সে আজ প্রথম থেকেই হারছিল।

উমাপ্রসাদ বোর্ডের পয়া কুড়োতে কুড়োতে বলল, সে কি, এখনই কেন। আরো কয়েকটা ডিল খেলে যাও।

যার বাড়িতে খেলা হচ্ছিল, সে মানে তুলসী গোস্বামীও হীরু তালুকদারের কথায় সায় দিল, তালুকদার ঠিকই বলেছে। এখন থাক। বিকেলের দিকে না হয় আবার বসা যাবে।

উমাপ্রসাদ এবং স্যাণ্টো পাল ওদের প্রস্তাবে খুশি হল না। কেননা, এই তিনতাসের খেলাই ওদের একমাত্র উপজীবিকা।

স্যাণ্টো পাল বলল, সবে খেলাটা জমে এসেছিল—

হীরু তালুকদার একটা সিগ্রেট ধরাল, লোকালিটির মাঝখানে একটা ডেডবডি। সাত আট ঘণ্টা হয়ে গেল, এখনো রিমুভের কোন ব্যবস্থা হল না। এর কোন মানে হয়।

উমাপ্রসাদ রুক্ষ কণ্ঠে বলল, মানেটানে নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামায় না হে তালুকদার—

তুলসী গোস্বামী বলল, যাই বলো, ডেডবডিটা পচে উঠছে। দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখের নাগালের মধ্যে একটা আনক্যানি মিউটিলেটেড বডি—।— বিরক্ত হলে তুলসী গোস্বামীর মুখে ইংরেজী বোল ফোটে।

হীরু তালুকদার ওর কথায় ভিয়েন চড়াল, যা বলেছ। কেউ একবার লোকালিটির হেলথ অ্যাণ্ড হাইজিনের কথাও ভাবে না! আশ্চর্য--

স্যাণ্টো পাল ধমকে উঠল, রাখো তোমার হেল্‌থ্ অ্যাণ্ড হাইজিনের কথা। এসব নিয়ে কর্তাব্যক্তিরা কেউ মাথা ঘামালে দেশ আর সমাজের কি আজ এ অবস্থা হত!

এমন সময় তুলসী গোস্বামীর স্কুল-পড়া ছোট ছেলেটি ঘরের ভেতরে ছুটে এল।

তুলসী গোস্বামী জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে রে পিণ্টু—

ধাঙড় এসেছে। মড়াটাকে নিয়ে যাবে।—বলল পিণ্টু। এই খবরটা বাবাকে দেবার জন্য অনেকক্ষণ হল পিণ্টু দোতলার সিঁড়ি ঘরে দাঁড়িয়ে মড়াটাকে লক্ষ করছিল।

স্যাণ্টো পাল তাস কুড়িয়ে নিয়ে সাফল্‌ দিতে দিতে বলল, তাহলে আর দুচারটে ডিল্‌ হয়ে যাক। মোটে তো একটা বাজে—

দাঁড়াও,—উঠে দাঁড়াল তুলসী গোস্বামী, আগে জানালাটা

ভেজিয়ে দিয়ে আসি। ডেডবডিটডি দেখলে আবার আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি।

হীরু তালুকদার তখন ঘন ঘন সিগ্রেট ফুঁকে চলেছে।

লেটো অনেকক্ষণ হল ফিরে এসেছে। বুম্বার পাত্তা নেই।

ওরা মদ খেয়ে চুর্ হয়েছিল।

লেটো বলল, মাইরি শালা, আমার বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। ওস্তাদ যে কোথায় গেল—

পটলা মাথা নাড়ল, যা বলেছিস। কাল সারা রাত্তির একদম ঘুমোই নি। তার ওপর শালা যা গরম পড়েছে। একটু স্নান করতে না পারলে—

ঘোতন বেঞ্চে টান টান হয়ে শুয়েছিল। ওদের কথায় উঠে বসল। বুড়ো আঙুল দিয়ে চোখের পিঁচুটি তুলতে তুলতে বলল লেটোকে, ভাগ্ বাঞ্চৎ। তোর জন্যেই তো সব গড়বড় হয়ে গেল। তুই শালা মড়া দেখতে গেছলি কেন। বাপের জন্মে মড়া দেখিস নি—

লেটো উত্তর দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় কাঠের সিঁড়িতে দুদ্দাড় আওয়াজ শোনা গেল। বোঝা গেল বুম্বা ফিরছে।

ঘর্মাক্ত কলেবর বুম্বা। ভেতরে ঢুকতে লেটো শুধোল, এত দেরী হল যে গুরু?

বুম্বার মুখ থমথমে। সে এগিয়ে এসে বলল ঘোতনকে. নে, সরে বস।

ঘোতন জায়গা করে দিয়ে বলল. এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

বুম্বা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল. আর বলিস না। লাশটা দেখে ফিরবার পথে শিউচরণের সঙ্গে দেখা। কালোর দোকানে বসে চা খাচ্ছিল। ডাকল। বহুৎদিন বাদে দেখা, দুটো কথা না বলে কি চলে আসা যায়।

ঘোতন চোখ বড় করল, তাই নাকি, শিউচরণ ! শালা কেমন আছে রে ?

বুম্বা আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেছে ফেলল, ভালই। দুর্গাপুরে লোহার ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। বিয়ে থা করে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তোফা আছে। বেঁচে গেছে ব্যাটা। শালা, আমাদের মত পস্তাচ্ছে না—

শিউচরণ এককালের জবরদস্ত মস্তান। এ লাইনে বুম্বা-ঘোতনের হাতেখড়ি ওর কাছেই।

বুম্বা ফের বলল, পটলা, একটা বোতল দে তো এদিকে। বুকটা শুকিয়ে মাইরি কাঠ হয়ে আছে।

লেটো শুধোল, তুমি মড়াটার কাছে গিয়েছিলে ওস্তাদ ?

বুম্বার জন্য একটা বোতল আলাদা করে রাখা হয়েছিল। পটলা সেটা এগিয়ে দিয়ে ছিপি খুলতে খুলতে বলল বুম্বা, গিয়েছিলাম। তা, তুই শালা এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?

বুম্বা ঢকঢকিয়ে অনেকটা মদ গলায় চালান করে দিল।

লেটো বলল, ইষ্টিশনের কাছেই ছিলাম।

বুম্বার গলা ভারি হয়ে এল, ইষ্টিশনের কাছে এতক্ষণ কেন রে শালা !

—মড়াটাকে তুমি ঠিকমত লজর করেছিলে ? প্রসঙ্গটাকে ঘোরাতে চাইল লেটো।

—করেছিলাম। মড়া মড়া করছিলি কেন। লাশ বল্—

—আমার মনে হয়, কাজটা উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে ওস্তাদ।

—উল্টাপাল্টা ? সে আবার কি !— ঘোতন বলল।

কাল রাতে ঘুরঘুট্টি আঁধার ছিল। আমার মনে হয় ভুল লোককে খতম হয়েছে—

—একথা বলছিস কেন ?—প্রশ্নটা পটলার।

—ভদ্দরলোকের লাশ। হাতে পাথরের আংটি। সাইড পকেটে টাকা। বিলকুল ঠিক আছে। কিছু হাতায় নি।

—তুই শালা ছিন্তাইয়ের কেস ভাবছিস কেন।—ঘোতন বলল।

—মোটেই ভাবছি না। সেইখানেই তো কেসটা গড়বড়ে ঠেকছে—

—মেয়েছেলে ফেলে বা সম্পত্তি টম্পত্তির ব্যাপারও তো হতে পারে। আজকাল কত কারণে মার্ডার হয়—, লেটো বলল।

—পার্টিফার্টির কেসও হতে পারে।—লেটোর অনুমানে রঙ চড়াল ঘোতন।

—উহুঁ সেরকম নয়। ভদ্দরলোকেরা করেনি। এ রীতিমত পাকাহাতের কাজ। সেরেফ গলার নলিটা কেটেছে—

লেটোর কথা শেষ হল না। চুপকর্ শালা,—বুম্বা হুংকার ছাড়ল। ওর হাতের চাপড়ে ভাঙা টেবিল ঠকঠক করে নড়ে উঠল। বোতলের বাকি মদটুকু সাবাড় করে গাঁক গাঁক করে ফের বলল বুম্বা, আজকাল উল্টোসোজা বলে কোন কথা আছে নাকি রে। দিনকাল কি পড়েছে টের পাচ্ছিস না! মানুষ মরে গেলেই সে ব্যাটা লাশ হয়ে যায় আজকাল। সেরেফ লাশ। আর কিছু নয়। তুই মরলেও লাশ আবার শালা ভদ্দরলোকের বাড়ির ছেলে মরলেও লাশ। কে মরল—তা নিয়ে কি মাথা ঘামাচ্ছে?

ঘোতন গম্ভীর চালে মাথা নাড়ল, ঠিক বলেছিল বুম্বা।

ধাঙড়দ্বয় লাশটাকে নিয়ে যাবার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিল।

লালকাপড় নিয়ে একজন লাশের মাথার কাছে গিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, বড্ড গন্ধা মাল রে কাল্লু—

কাল্লু নামধারী ধাঙড়টি তখন লাশের পায়ের কাছে। সে বলল, জ্যান্ত মানুষই গন্ধা হয়ে গেছে। আর এতো শালার মড়া—

লাশটা চলে যাচ্ছে। নিকটবর্তী ঘরবাড়ির দরজা জানালা সব সশব্দে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুএকজন অত্যুৎসাহী দরজার-ফাঁক কিংবা জানালার খড়খড়ি দিয়ে লাশটাকে শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে।

তুলসী গোস্বামীর বউ দোতলার সিঁড়ি-ঘরে। ছেলে পিণ্টু সকাল থেকে লাশটাকে দেখে যাচ্ছিল পরম উৎসাহ ভরে। ছেলের কান ধরে টানতে টানতে সে সিঁড়ির দিকে নিয়ে আসছিল। আর চেঁচাচ্ছিল, হারামজাদা ছেলে। সকাল থেকে মড়াটাকে দেখ-ছিস। তোর কি ঘেন্নাপিত্তি নেই। মাগো—

জটাপাগলা তখন ডোবার মাঝখানে। থেকে থেকে ডুব দিচ্ছিল। আর ভুস্ করে ভেসে উঠছিল। ভেসে উঠেই বিকট হেসে চেঁচিয়ে উঠছিল, হি-হি-হি। মর্, মর সব শালা।

·

লাশটা গোরাবাবুর হতে পারে। মিহির সান্যালের হতে পারে। শ্রাবণীর সুহাসদার হতে পারে। আবার এদের কেউ নাও হতে পারে। বুম্বার কথাই বোধহয় ঠিক। দিনকাল ভাল নয়। এখন যে কোনো মানুষই খুনের যোগ্য। এখন মানুষ মরলে সে সেরেফ লাশ বনে যায়। তার আর কোন পরিচয় থাকে না।

তবু অন্ততঃ একজন লাশটাকে মানুষ বলে সনাক্ত করেছিল।

ধাঙড়দ্বয় যখন লাশটাকে লাল কাপড়ে ঢেকে দিচ্ছে—তখন পেছন থেকে কে যেন কাতরকণ্ঠে বলে উঠল, থাম বাছারা। একটু-খানি সবুর কর্—

দেখা গেল—রেললাইনের ওপর এক বুড়ি দাঁড়িয়ে। সে আর কেউ নয়, এতক্ষণ যে রেলওয়ে ওভারব্রীজের নিচে বসে ভিক্ষে করছিল, সেই বুড়ি। তার একহাতে একখানা গরাণের লাঠি। আরেক হাতে চলটা-ওটা এনামেলের বাটি। বাটিতে কয়েকটা খুচরো পয়সা।

বুড়ি লাশের কাছে এগিয়ে এসে বলল, তোদের কি দয়াধর্ম্ম বলে কিছু নেই। একটা মনিষ্যি। সগ্‌গে যাচ্ছে। কোন্ মায়ের নাড়িছেঁড়া ধন। দাঁড়া, ওর একটু গতি করে দিই।

বুড়ি ডোবার দিকে এগুলো। হাঁটু গেঁড়ে বসল। এনামেলের বাটিটা রাখল ঘাসজমিতে। আঁজলা ভরে জল নিল। তারপর রেললাইনের দিকে এসে লাশের মুখে জল ঢালল। বিড়বিড় করে কিছু বলল। শেষে চেঁচিয়ে উঠল, দেশে কি আর লোক নেই-রে! সব কি মরে ভূত হয়ে গেছে—

অতঃপর ধাঙড়দ্বয় লাল কাপড়ে লাশটাকে পেঁচিয়ে বাঁশের সঙ্গে জম্পেশ করে বেঁধে নিয়ে কাঁধে তুলল। এবং অবশেষে, তারা শহরতলার অধিবাসীদের উৎকণ্ঠা-ভয়-বিরক্তি ঘৃণা সবকিছুর অবসান ঘটিয়ে দ্রুত-প্ল্যাটফরমের দিকে ছুটতে লাগল।

বুড়ি তখনো রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়ে। একহাতে গরাণের লাঠির সাহায্যে ঝুঁকেপড়া কম্পমান দেহকে সামাল দিচ্ছিল। আর, অন্যহাত দিয়ে চোখের জল মুছছিল ঘন ঘন।

এদিকে, এনামেলের বাটিটা কখন ঘাসজমি থেকে ডোবার জলের দিকে গড়িয়ে নেমে গেছে—বুড়ির খেয়াল নেই।

বুড়ি লাশের কাছে এগিয়ে এসে বলল, তোদের কি দয়াধর্ম্ম বলে কিছু নেই। একটা মনিষ্যি। সগ্‌গে যাচ্ছে। কোন্ মায়ের নাড়িছেঁড়া ধন। দাঁড়া, ওর একটু গতি করে দিই।

বুড়ি ডোবার দিকে এগুলো। হাঁটু গেঁড়ে বসল। এনামেলের বাটিটা রাখল ঘাসজমিতে। আঁজলা ভরে জল নিল। তারপর রেললাইনের দিকে এসে লাশের মুখে জল ঢালল। বিড়বিড় করে কিছু বলল। শেষে চেঁচিয়ে উঠল, দেশে কি আর লোক নেই-রে! সব কি মরে ভুত হয়ে গেছে—

অতঃপর ধাঙড়দ্বয় লাল কাপড়ে লাশটাকে পেঁচিয়ে বাঁশের সঙ্গে জম্পেশ করে বেঁধে নিয়ে কাঁধে তুলল। এবং অবশেষে, তারা শহরতলার অধিবাসীদের উৎকণ্ঠা-ভয়-বিরক্তি ঘৃণা সবকিছুর অবসান ঘটিয়ে দ্রুত-প্ল্যাটফরমের দিকে ছুটতে লাগল।

বুড়ি তখনো রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়ে। একহাতে গরাণের লাঠির সাহায্যে ঝুঁকেপড়া কম্পমান দেহকে সামাল দিচ্ছিল। আর, অন্যহাত দিয়ে চোখের জল মুছছিল ঘন ঘন।

এদিকে, এনামেলের বাটিটা কখন ঘাসজমি থেকে ডোবার জলের দিকে গড়িয়ে নেমে গেছে—বুড়ির খেয়াল নেই।